Contents

দ্বি-বার্ষিক
কর্মী সম্মেলন
২০০০

স্মরণিকা

বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুব সংঘের
কর্তৃক প্রদত্ত সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদনা ঃ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

স্মরণিকা

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০

সম্পাদনায়ঃ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

প্রকাশ কাল

জামাদিউছ ছানী ১৪২১
আশ্বিন ১৪০৭
সেপ্টেম্বর ২০০০

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা
এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ ডিজাইনঃ মুহাম্মাদ সুলতানুল ইসলাম
মুদ্রণঃ দি বেঙ্গল প্রেস রাণী বাজার, রাজশাহী।
মূল্যঃ ১২ টাকা মাত্র।

প্রকাশকঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬১৭৪১

SHARANIKA
De-Barshik Karmi Shammelan 2000
Edited by : Muhammad Jalal Uddin.
Published by :
Bangladesh Ahlehadees Youth Association.
Price: Tk. 12.

সূচীপত্র

- আমীরে জামা'আতের বাণী ২
- কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী ৩
- সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ ৪

- সত্য আপোষহীন (ভাষণ) ৫
- তাক্বওয়ার গুরুত ৮
- আল্লাহভীরু যুবকের পরিচয় ১১
- যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ ১২
- সামাজিক অনাচার ও তার কুফল ১৪
- মৌলবাদঃটার্গেট ইসলাম ১৭
- দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ১৯
- আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে ২১
- অপসংস্কৃতি ও যুবসমাজ ২৬
- আল্লাহর পথে জিহাদ ২৯
- শিখা অনির্বাণ শিখা চিরন্তন ৩২
- ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ৩৫
- প্রতিবেদন (১৯৯৯-২০০০১) ৩৮
- কর্মী সম্মেলন'৯৬ প্রতিবেদন ৪০
- বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যবসংঘ (১৯৭৮-২০০০) ৪২

কবিতাঃ

- এসো মুজাহিদ ১৬
- হুতাশন দমন ২১
- সত্যের ডাক ২৯
- সে তো ভাল নয় ৩২
- আহবান ৩৫
- ذكرى ناصر الدين الألبانى ৪২
- Advice ৪২
- ইচ্ছে ৪৭
- স্মরণিকা ৪৮
- সুখ ৪৮
- সত্যের আহবান ৪৮
- ফিরে দেখ ইতিহাস ৪৮

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

মানবজাতির সার্বিক পরিশুদ্ধি, দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তির শাশ্বত পয়গাম নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন পৃথিবীতে। তিনি ইসলামের সমুজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা বর্বর, অসভ্য ও উচ্ছৃংখল মানবজাতিকে সভ্য, সুশৃংখল ও আদর্শ জাতিতে পরিণত করেন। ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা লাভ করে। অর্পিত হয় তাদের উপর বিরাট দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, 'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে' (আলে-ইমরান ১১০)।

পৃথিবীতে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং সত্য-ন্যায়ের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার গুরু দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এ মহান দায়িত্ব পালনে মুসলিম জাতি আজ তেমন সচেতন নয়। এক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা ও অবহেলা মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্য ও ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। ফলে তাদের ললাটে লেপন হয়েছে কলংকের কালিমা। অপরদিকে বাতিল শক্তি সত্য-ন্যায়ের পতাকাকে ভূ-লুণ্ঠিত করতে চায়। সেজন্য তারা আল্লাহ প্রেরিত মহাসত্যকে এ ধরা থেকে মুছে দিতে সদাতৎপর। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহকে নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনে সাড়া না দিলে মুসলিম ঐতিহ্য যে কোন সময় ভূ-পৃষ্ঠ হ'তে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এ পর্যায়ে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ** অহি-র সত্যকে সু-প্রতিষ্ঠা এবং অহি বিরোধী কার্যকলাপের উচ্ছেদ সাধনে দা'ওয়াত ও জিহাদের বলিষ্ঠ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংগঠনের কর্মীদের উপর সত্যদ্রোহীদের পক্ষ হ'তে বিভিন্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ও নির্যাতন। কিন্তু পরকালীন মুক্তির চেতনায় যারা উজ্জীবিত, তাদেরকে কোন বাধাই নিজ দায়িত্ব পালন থেকে দূরে রাখতে পারেনি। বরং এ ঘাত-প্রতিঘাত প্রকান্তরে তাদেরকে 'হক্ব' প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণাই যুগিয়েছে। প্রেরণা দান করেছে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজ জান-মাল ও সময় কুরবাণী দিতে। বলা বাহুল্য, কর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফসলই হচ্ছে **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেল ২০০০**। এবারের কর্মী সম্মেলন সচেতন তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ প্রদত্ত অহি-র বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করার দৃপ্ত শপথ নিয়ে প্রকাশিত হ'ল **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন২০০০ স্মরণিকা**, ফালিল্লাহিল হাম্দ। যে সকল ভাই-বোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা পাঠিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। এছাড়া স্মরণিকা প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমরা আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, সেই সাথে তাদেরকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা অভিনন্দন। আল্লাহ্পাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন! আমীন!!

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০ 'স্মরণিকা' উপলক্ষ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد:

পিছনে কৃত, আগামীতে করণীয় এবং বর্তমানের তৎপরতা সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়াই হ'ল কোন **'স্মরণিকা'** প্রকাশের মূল লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে প্রতিষ্ঠিত **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** তাদের এশতকের সর্বশেষ দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত।

সমাজের কুটিল চক্রে বিধ্বস্ত বা হত-বিহবল তারুণ্যকে আল্লাহ্ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার দৃপ্ত শপথ নিয়ে আগুয়ান **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাক, এই দো'আ করি। সাথে সাথে 'স্মরণিকা'-র সাহিত্যাংগনে নবাগত বুলবুলিদেরকে দেশে বিরাজমান সাংস্কৃতিক অপশক্তি রোধে আগামী দিনের কলমী জিহাদের অগ্রসৈনিক হয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের 'সবুজ বিহঙ্গ' হ'তে ব্রতী হওয়ার আহবান জানাই।

(প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০** উপলক্ষ্যে একটি যুগোপযুগী স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহর সমীপে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুল্লিাহ। বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে এই কর্মী সম্মেলনের গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি শতধাবিভক্ত মুসলিম জাতিকে সঠিক পথের দিশা প্রদানে অত্র স্মরণিকাটিও একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাবাহী যুবকেরা অহি-র সমাজ প্রতিষ্ঠায় মসিযুদ্ধে যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছে তা প্রশংসার দাবীদার। হে আল্লাহ! তুমি এই সমস্ত লেখকদের হাতকে আরও শাণিত কর, যেন তারা বর্তমানে প্রচলিত সকল প্রকার অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবল থেকে সমাজ তথা গোটা জাতিকে মুক্ত করে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। আমীন!!

(মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান)
সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সত্য আপোষহীন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[২৫শে অক্টোবর'৯৬ শুক্রবার সকালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রদত্ত ভাষণ]

বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দ.....।

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

আস্‌সালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ

আপনারা সকলে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করুন। 'বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘে'র দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্বতন্ত্রভাবে এবার প্রথম নতুন ও পুরাতন কর্মীদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এর মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বতের বন্ধন আরো মযবুত হবে এবং আন্দোলনের গতি আরও যোরদার হবে। আমি উদ্যোক্তা ভাইদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় সাথীগণ!

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এক কথায় ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান একটি উল্কাপিণ্ডের ন্যায়। সভ্যতা, মানবতা ও ন্যায়বিচার বর্তমানে ভূলুণ্ঠিত। অন্যায়কারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে ন্যায়পন্থীরা আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টির মূল কারণ একটাই। আর তাহ'ল আমাদের **ঈমানহীনতা**। কেননা প্রত্যেক মানুষ এক একটি বিশ্বাসে ভর করে এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে। স্ব স্ব লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তার জীবন পথে পদচারণা করে। এই বিশ্বাসকেই ইসলামী পরিভাষায় 'ঈমান' বলা হয়। এই বিশ্বাসের পরিবর্তনের মাধ্যমেই একটি সমাজের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। সহজ সরল ধর্মভীরু এই মুসলিম দেশটির ঈশান কোনে আবির্ভূত হয়েছে দেশী-বিদেশী সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীদের কুটিল চক্রান্তের গাঢ় মেঘ, যা ঘনঘটার আকারে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ইতিমধ্যেই পাগলা হাতীর মত সমাজ জীবনকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপরে ঈমানের যে গভীর অনুভূতি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিশ্বের উন্নত সেরা সভ্য মানুষে পরিণত করেছিল, শত অভাবের তাড়নায়ও যাদের দ্বারা কোন অন্যায় আচরণ সম্ভব ছিল না। তারাই আজ বস্তুবাদী দুনিয়াসর্বস্ব মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে নৈতিকতাহীন পশুতে পরিণত হ'তে চলেছে। জ্বলন্ত অঙ্গারে আত্মাহুতি দানকারী উড়ন্ত পতঙ্গ যেমন নিজের আসন্ন ধ্বংসকে নিশ্চিত জেনেও নিঃসংকোচে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, ঈমানহীন দুনিয়াদার মানুষও তেমনি ভোগবাদী আদর্শের মায়া-মরীচিকার পিছনে ছুটে কামনা-বাসনার জ্বলন্ত অঙ্গারে নিজেদের ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও সেদিকেই দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে এদের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের শাসনযন্ত্র হ'তে শুরু করে নিম্নস্তরের নেতৃস্থানীয় মানুষ পর্যন্ত ভোগবাদী বিশ্বাসের রাহুগ্রাসে ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

আল্লাহ্‌পাক মানুষকে এ পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে সৃষ্টি করেছেন, সে ভূখণ্ডে বসবাসরত মানব গোষ্ঠীর জন্য তার উপরে বিশেষ কিছু গুরুদায়িত্ব অর্পন করেছেন। বাংলাদেশের এই সবুজ ভূখণ্ডের মানুষগুলিকে আল্লাহ্‌মুখী করে সুন্দর ও সুখী সমাজ কায়েমের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগণের। কেননা আল্লাহপাক আমাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করে এরশাদ করেছেনঃ كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে" (আলে ইমরান ১১০)। উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে আমরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হব ও সমাজ বিপর্যস্ত হবে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজ তার দায়িত্ব অনেকাংশে ভুলতে বসেছে এবং পাশাপাশি ভোগবাদী আদর্শ ও সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট ধূম্রজালে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। আমি মনে করি এদেশে বর্তমানে বস্তুগত দারিদ্রের চাইতে বিশ্বাসগত দারিদ্রই প্রকট আকার ধারণ করেছে। ঈমানের দারিদ্র হ'তে তাই আমাদেরকে অবশ্যই মুক্ত হ'তে হবে। স্মরণ করুন আল্লাহর বাণীঃ بل تؤثرون الحيواة الدنيا و الآخرة خير و أبقى "বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী"(আ'লা ১৬)।

ভোগবাদী আদর্শ মানুষকে কখনোই অল্পে তুষ্ট হ'তে দেয় না। আরো চাই আরো চাই- এই অধিক পাওয়ার তাড়না তাকে কবরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাড়া করে ফেরে।

স্মরণ করুন আল্লাহর অহিঃ الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر 'অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে ফেলেছে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও' (তাকাছুর ১-২)। মূলতঃ ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী আদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ইসলাম তার বিশ্বাসীদেরকে আখেরাতমুখী করে গড়ে তোলে। আল্লাহ্‌র নিকটে জবাবদিহির তীব্র দায়িত্বানুভূতি মুসলমানের কথা ও কর্মকে সুন্দর ও সুসমন্বিত করে তোলে। আর তাই মুসলমানের সমাজ হয়ে উঠে পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি চরমভাবে বস্তুবাদী হয়ে উঠে এবং তার চরম ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে এ পৃথিবীকে

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

পরিণত করে অনাচার ও অশান্তির এক দুঃসহ কারাগারে। ভোগের প্রতিযোগিতায় মত্ত মানুষ নেমে যায় পশুত্বের নিম্নতম স্তরে। ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি কথাগুলি তাদের কাছে হয়ে উঠে নিতান্তই কথার কথা। ধর্মগ্রন্থ কিংবা দেশের শাসন সংবিধানে যত সুন্দর কথাই লেখা থাক না কেন, সেগুলি তাদের কাছে শিল্পীকণ্ঠের সুন্দর কোরাসের মতই শুনায়। হৃদয়ে যা রেখাপাত করে না। কর্মজীবনে যার প্রতিফলন ঘটে না। স্মরণ করুন পবিত্র কুরআনের সুন্দরতম বাণীচিত্রঃ

لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل ط أولئك هم الغافلون- 'আমরা সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও ইনসান । তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু দেখেনা। তাদের কান রয়েছে কিন্তু শুনতে চায়না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তার চাইতেও নিকৃষ্ট। তারাই হ'ল প্রকৃত গাফেল' (আল-আরাফ ১৭৯)।

বাংলাদেশে আমরা অধিকাংশই মুসলমান। এদেশের শাসনযন্ত্রের মালিকানা মুসলমানদেরই হাতে। অথচ এদেশের মানুষ অন্যান্য দেশের তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। এর মৌলিক কারণ হিসাবে আমরা আমাদের ঈমানের দুর্বলতাকেই দায়ী করি। এই দুর্বলতা সাধারণ জনগোষ্ঠীর চাইতে শাসক সম্প্রদায়ের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানকারী লোকদের মধ্যেই সবচাইতে বেশী। আর তাদেরই প্রভাবে বরং তাদেরই প্ররোচনায় আজ সমাজের মেরুদন্ড যুবশক্তি নৈতিক দিক দিয়ে দেওলিয়াত্বের পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। আজকের শিক্ষিত যুবসমাজ বিভিন্ন দলের ভাড়াটে সন্ত্রাসী, হাইজাকার, ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ অথবা দলীয় আর্মস ক্যাডার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা অথবা অনীহার কারণেই এদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা বর্তমানে কোটির অংক ছাড়িয়ে গেছে। আর এদেরই বেকারত্বের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ের চতুর নেতারা। উপরন্তু নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার ফলে শিক্ষিত তরুণ সমাজ ক্রমেই ভোগবাদী হয়ে উঠছে। চাকুরী-বাকুরীর বিভিন্ন স্তরে এমনকি চিকিৎসার ন্যায় জনসেবা মূলক চাকুরীতে গিয়েও এরা শোষকের বীভৎস মূর্তি নিয়ে জনগণের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। ফলে কি শিক্ষিত বেকার, কি কর্মজীবী বা উচ্চ পর্যায়ের চাকুরীজীবী বা শাসনযন্ত্রের পরিচালক সকলেই চরিত্রগত দিক দিয়ে হয়ে উঠেছে একেকজন ভোগবাদী শোষক। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামিয়াত বিষয়ে ১০০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষীণ আলোটুকুও তরুণ ছাত্রদের অন্তর থেকে মুছে যায়। ডঃ কুদরত-ই-খুদা-এর খোদাহীন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে আল্লাহ্ভীরু বাংলাদেশী ছাত্র সমাজের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার অপতৎপরতা চলছে। এমনকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেও ইসলাম বৈরী বৈরী ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতি-মর্জির নিকটে সমর্পণ করার সমস্ত আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের ও সাথীদের করণীয় কি হবে?

সত্যের পথে আপোষহীনঃ আমরা মনে করি আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে স্ব স্ব ঈমানকে মযবুত করা। যে ঈমানে প্রাচীন বা আধুনিক কোনরূপ সন্দেহবাদের সংমিশ্রণ থাকবে না। আধুনিক বস্তুবাদী আদর্শের সাথে যে ঈমান আপোষ করবে না। ইসলামের নামে সৃষ্ট যুগে যুগে বিভিন্ন তরীক্বা ও মাযহাবী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধূম্রজাল যে ঈমানের স্বচ্ছ নীল আকাশকে রাহুগ্রস্ত করবে না।

দ্বিতীয়তঃ আমাদেরকে স্ব স্ব কর্মজীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হ'তে হবে। কারণ ইসলাম মূলতঃ কর্মের নাম, কেবলমাত্র বিশ্বাসের নাম নয়। বিশ্বাস বা ঈমান অনুযায়ী আমল যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে মুসলিম। আর এই আমলের সঠিক দিক-নির্দেশিকা হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের কারণে পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে মুসলিম জাতি আজ শতধাবিভক্ত ও পরস্পরে শত্রু ভাবাপন্ন। এমনকি খোদ আমরাই আজ স্বগোত্রীয় হিংসার শিকারে পরিণত হয়েছি। এই অবস্থার আশু নিরসনের জন্য আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যেতে হবে। ইসলামের নামে বা আধুনিকতার নামে সৃষ্ট যাবতীয় মাযহাব, মতবাদ, তরীক্বা ও ইজম হ'তে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্ প্রেরিত অহি-র বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমাদের আমলী যিন্দেগীকে বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র দূর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র জীবনে হৌক আর কর্মজীবনে হৌক, ব্যক্তি জীবনে হৌক আর সমাজ জীবনে হৌক, সর্বাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ট অনুসারী হিসাবে নিজেকে উত্তম দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করতে হবে। শ্লোগান ও মিছিল দিয়ে নয়, নিজের আচরণ দিয়ে বাতিলকে সর্বত্র মুকাবিলা করতে হবে। রাসূলের ও তাঁর অতুলনীয় সাথীদের আচরণকে মনে রাখুন। محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود- "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ছিলেন কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ও আপোষে রহমদিল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। আর তাদের ললাটদেশে দেখবেন সিজদার চিহ্ন" (ফাৎহ ২৯)। তাই বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়

বরং বাতিলকে প্রতিরোধ করেই প্রতিটি ক্ষেত্রে হক্বকে বিজয়ী করতে হবে। মনে রাখুন আল্লাহর বাণীঃ هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون– "তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে তিনি সকল ধর্মের উপরে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না"(ছফ ৯)। পিতা ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শ্রবণ করুনঃ

قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنابكم وبدأ بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده–

"তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর তাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হ'ল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে" (মুমতাহিনা ৪)।

শ্রবণ করুন আমাদের রাসূলের চূড়ান্ত জওয়াব মুশরিক নেতাদের আপোষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে-

قل يآايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون

"আপনি বলুন, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা কর । আর তোমরাও ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য"(কাফিরূণ ১-৬)।

তৃতীয়তঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল পর্যায়ের মুরব্বী, যুবক, মহিলা ও শিশু-কিশোরদেরকে একই আন্দোলনের সাথী হিসাবে ভাবতে হবে। সকলকে একই লক্ষ্যপথের যাত্রী হিসেবে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর সত্যকে সামনে নিয়ে নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলার যমীনে আমাদের সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রত্যেককে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দা'ওয়াতের ফরয দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যেতে হবে। দা'ওয়াত দেওয়া কোন নফল দায়িত্ব নয়। আল্লাহ পাক বলেন, وادعو الى ربك ولاتكونن من المشركين 'তুমি ডাক তোমার প্রভুর দিকে এবং তোমরা অবশ্য অবশ্য মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (ক্বাছাছ ৮৭)। বুঝা গেল মুশরিক হয়ে মৃত্যু বরণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব যিনি যেখানে অবস্থান করুন না কেন সবাইকে সর্বাবস্থায় দা'ওয়াতের কাজ ফরয মনে করেই পালন করতে হবে। কোনরূপ অজুহাত ও অলসতা যেন আমাদেরকে এই ফরয দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না রাখে। যিনি গতকাল 'কর্মী' ছিলেন আজ 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হ'লেন, তার দায়িত্ব অনেকগুণ বৃদ্ধি পেল। আবার যিনি বয়সের (৩২বৎসর) কারণে 'যুবসংঘ' থেকে অবসর নিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাকে জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের অধিকতর দায়িত্ব পালনের জন্য উদারভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। আমরা বলতে চাই যে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মহূর্ত পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোন কর্মীর কোন অবসর নেই। কবির কথায়ঃ

অবসর কোথায়, কোথায় শ্রান্তি
এখনো কাজ রয়েছে বাকী
তাওহীদ আজো পূর্ণ কিরণ
দিগ-দিগন্তে দেয়নি আঁকি।

বাংলার সমাজ জীবনের সর্বত্র শিরক ও বিদ'আতে পুঁতিগন্ধময় পরিবেশ বিরাজ করছে। নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারীরা যদি তাদেরকে আহ্বান না করে, তাহ'লে কারা তাদেরকে পথ দেখাবে? কারা তাদেরকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে আনবে?

আগামী দিনের সোনালী ভবিষ্যতের রূপকার হিসাবে যুবসমাজকে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই মাতৃভূমিকে সাক্ষাত ধ্বংসের দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামের দিকে সকলকে ফিরে আসতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন ব্যতীত যার কোন বিকল্প নেই। তাই বিগত দিনের যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমান সময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই আন্দোলনই ফিরিয়ে আনতে পারে ইসলামের স্বচ্ছ সুন্দর আদি রূপ। আল-হেরা ও আল-মদীনার ফেলে আসা সেই নির্ভেজাল ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও এর সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ।

আমি আপনাদেরকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সমাজ জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে খালেদ, তারেক্ব, মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিম, মূসা বিন নুছাইর ও কুতাইবা বিন মুসলিমের ন্যায় আপোষহীন দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে আবির্ভূত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হৌন। আমীন॥

Contents

তাক্বওয়ার গুরুত্ব

-অধ্যক্ষ আবদুস সামাদ

يايها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقته ولاتموتن الا وأنتم مسلمون

ওগো মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্কে যথাযোগ্যভাবে ভয় কর। আর তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না (আলে-ইমরান ১০২)।

মহান আল্লাহ্ এই আয়াতে তাক্বওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুসলিম জনতার জাতীয় শক্তির ভিত্তিই হচ্ছে তাক্বওয়া। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর অপসন্দনীয় কাজ-কর্ম থেকে বেঁচে থাকে, তারাই মুত্তাক্বী। আর এই মুত্তাক্বীদের জন্য পবিত্র কুরআনের প্রথম ভাগেই সূরা বাক্বারার দ্বিতীয় আয়াতে কুরআনকে هـدى للمتقـين বা মুত্তাক্বীদের পথনির্দেশ বলা হয়েছে। অবশ্য কুরআনের হেদায়েত ব্যাপক হ'লেও হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাক্বীদের বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে। কারণ মুত্তাক্বী কুরআনের হেদায়েতের সৌজন্যে সংশোধিত জীবন যাপন করে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। বস্তুতঃ যারা মুত্তাক্বী তাদের জন্যই জান্নাত তৈরী করে রাখা হয়েছে।

'তাক্বওয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভয় করা অর্থেও এর ব্যবহার দেখা যায়। আসলে যে সব বিষয় থেকে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করার বিষয়ই বটে। তাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তির ভয় থাকে। তাক্বওয়ার কয়েকটি স্তর আছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শিরক ও কুফর থেকে আত্মরক্ষা করা। এ অর্থে মুসলিম মাত্রই মুত্তাক্বী বুঝা যায়, যদিও পাপে লিপ্ত থাকে। অনুরূপ অর্থ বুঝানোর জন্যও পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে 'মুত্তাক্বীন' ও 'তাক্বওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

তাক্বওয়ার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পসন্দনীয় নয়। এই স্তরের তাক্বওয়া আসলেই কাম্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে তাক্বওয়ার যে সব ফযীলত ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছে তা এই স্তরের তাক্বওয়াকে ভিত্তি করেই। স্বাভাবিকভাবে সকলের মধ্যেই অনুরূপ তাক্বওয়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

তাক্বওয়ার তৃতীয় স্তর হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট। নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারীরা এই স্তরের তাক্বওয়া অর্জন করে থাকেন। এই স্তরের তাক্বওয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর সব কিছু থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে এই স্তরের তাক্বওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে- "তোমরা ঐ স্তরের তাক্বওয়া অর্জন কর যা তাক্বওয়ার হক্ব।" তাক্বওয়ার হক্ব হচ্ছে প্রতিটি কাজ-কর্মে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্কে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখা, কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বক্ষণ তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, কখনও তাঁর অকৃতজ্ঞ না হওয়া। বস্তুতঃ পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এভাবেই তাক্বওয়ার হক্ব আদায় করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলেছেন, "ওগো মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"

এই আয়াতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধান জারী করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হক্কুল ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতগুলো অধিকার রয়েছে যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এই জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয়,অথবা সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়, তাহ'লে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো স্ববংশীয় এতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় নির্ভর করে কেবল সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও এগুলো নির্ধারণ করা সম্ভব হ'তে পারে না। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহর ভয়-ভীতি এবং পারলৌকিক শাস্তির আশংকা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর এরই নাম তাক্বওয়া। আসলে এই তাক্বওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চাইতে অনেক বড় এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিয়ের খুৎবাতে উক্ত আয়াত পাঠ করতেন। উল্লেখ্য যে, খুৎবায় উক্ত আয়াত পাঠ করা সুন্নাত।

উল্লেখিত আয়াতে তাক্বওয়ার নির্দেশের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য গুণবাচক নামের মধ্যে থেকে এখানে 'রব' নামটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। অর্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা যিনি সমস্ত সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যাঁর রবূবীয়্যাত বা প্রতিপালন রীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

রবূবীয়্যাত বা প্রতিপালন রীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে দেদীপ্যমান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সেই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে- তিনি পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি মাত্র মানুষ হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহর ভয়-ভীতি এবং পারলৌকিক শাস্তির আশংকা ছাড়াও এই ভ্রাতৃবন্ধনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন তারা একে অন্যের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সকলে একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়।

এই আয়াতটিতে একদিকে আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। অপরদিকে পৃথিবীর সকল মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, তোমরা সেই মহান আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নাম নিয়ে তোমরা অন্যের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার দাবী করে থাক এবং যাঁর নামে শপথ করে তোমরা অন্যের কাছ থেকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাছিল করে থাক। এই পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, পিতার দিক থেকেই হোক কিংবা মাতার দিক থেকেই হোক সর্বপ্রকার আত্মীয়তার সম্পর্কের যথোপযুক্ত মর্যাদা দেবে, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং সেই অধিকার আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। হাদীছ শরীফেও আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার উপকারিতাও হাদীছ শরীফে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা মুত্তাক্বী তাদের গুণাবলী সংক্ষেপে পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার প্রথম রুকূতে মহান আল্লাহ্ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের হেদায়েত প্রাপ্ত মুত্তাক্বীদের পথই হচ্ছে ছিরাতে মুস্তাক্বীম। যারা সরল সঠিক পুণ্য পন্থা লাভ করতে চায়, তাদের কর্তব্য মুত্তাক্বীদের দলভুক্ত হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের পাথেয় রূপে গ্রহণ করা। এজন্যই মহান আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী উল্লেখ করার সাথে সাথে তাদের সফলতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون "তারাই আল্লাহ প্রদত্ত সৎ পথ প্রাপ্ত আর তারাই পূর্ণ সফলকাম।"

মুত্তাক্বীদের গুণাবলীর মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সৎকর্মের মূলনীতিগুলো বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুত্তাক্বীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন, ছালাত প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করা।

ঈমান বিল গায়িব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস করা বলতে সসব বিষয়গুলোকে বুঝানো হচ্ছে, যে গুলোর সংবাদ দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। এসব বিষয়ে মানুষ তার বুদ্ধি বলে ও ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম । ঈমান বিল গায়িবের মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্ত্বা, তাঁর ছিফাত বা গুণাবলী এবং তাক্বদীর সম্পর্কিত বিষয়গুলো; জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা, ক্বিয়ামত ও তা অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাবলী, ফেরেশতাকুল, আসমানী গ্রন্থরাজি এবং পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের বিস্তারিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এতে করে ঈমান বিল গাইব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)-এর শিক্ষা হিসাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হ'তে হবে।

ছালাত প্রতিষ্ঠা বলতে শুধুমাত্র ছালাত আদায় করা নয়; বরং ছালাতকে সর্বতোভাবে ঠিক করে যথাযথভাবে সমাধা করাকেই ছালাত প্রতিষ্ঠা বলা হয়। এককথায় ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই হচ্ছে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা।

নিজেদের জীবিকা থেকে সৎ পথে ব্যয় করা অর্থে যাকাত এবং অন্যান্য ছাদক্বা-খয়রাত সব কিছুকেই বুঝায়। সৎপথে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার একটা প্রবল আকাংখা প্রতিটি সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগিয়ে তোলাই আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

মুত্তাক্বীদের গুণাবলীর মধ্যে ঈমান, দৈহিক ইবাদত ছালাত এবং আর্থিক ইবাদত যাকাতের কথা বলা হয়েছে। ঈমানের পর এই দ্বিবিধ ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই আসলে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আয়াতের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে মুত্তাক্বী তারাই যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং আমল পূর্ণাঙ্গ। ঈমান এবং আমলের সমন্বয়েই ইসলাম। এই আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তাক্বওয়া একান্ত অপরিহার্য। মুত্তাক্বী সাফল্যজনকভাবে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা আশ্-শামসের প্রথম ভাগের আয়াতগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানে যেসব বস্তুর ক্বসম করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- সূর্য-চন্দ্র, দিবা-রাত্রি, আসমান-যমীন এবং আত্মা। বান্দার আত্মশুদ্ধি একান্তভাবে কাম্য বলেই মহান আল্লাহ্ আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে অনুরূপ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং

এতগুলো সৃষ্টির কসম করে জোর দিয়ে আত্মশুদ্ধির সাফল্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। تزكية نفس বা আত্মশুদ্ধি বলতে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করা বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখনি উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখনি এই দো'আ পড়তেন-اللهم ات نفسى تقواها انت وليها و مولها وانت خير من زكها. "হে আল্লাহ! আমাকে আন্তরিক তাকওয়া বা সংযমশীলতার তাওফীক দান করুন! আপনিই তো আমার আত্মার মালিক এবং আপনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধকারী।"

তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব। আর এই তাক্বওয়াই হচ্ছে জান্নাত লাভের উপায় ও উপকরণ। তাক্বওয়া অবলম্বনের ফলে আত্মা পাশবিক প্রবৃত্তি মুক্ত হয়ে বিনীতভাবে মহান আল্লাহর পানে ফিরে যেতে অভ্যস্ত হয়। পরিশুদ্ধ ও বিনীত মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে পারলে নিঃসন্দেহে জান্নাতের পথ সুগম হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود "যে অদৃশ্য করুণাময় আল্লাহ্কে ভয় করে বিনীত অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে হাযির হয় তাকে বলা হবে তুমি শান্ত-সমাহিত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর। অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন এটাই" (ক্বাফ ৩৩-৩৪)।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এ জাতীয় সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যেমন মহাগ্রন্থ কুরআনে বলা হয়েছেঃاذ جاء ربه بقلب سليم "যখন ইবরাহীম পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ অন্তরে আল্লাহর দিকে রুজু' হ'লেন" (ছাফ্ফাত ৮৪)।

মানুষের অন্তর সব রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে মুক্ত এবং পাক-পবিত্র না হ'লে তার কোন ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কাজেই তাক্বওয়ার মাধ্যমে যাবতীয় পাশবিক প্রবৃত্তি দমন পূর্বক অন্তরাত্মাকে সুস্থ, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে আল্লাহর ইবাদতের জন্য গড়ে তুলতে হবে। এরূপ প্রশান্ত ও শান্ত-সমাহিত হৃদয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারলেই বান্দা পরম সফলতা লাভ করতে পারবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেনঃ يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 'ওগো প্রশান্ত চিত্ত! তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও। তারপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (ফাজর ২৮-৩০)।

সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা না থাকলে মানুষ কল্যাণজনক কাজে অগ্রসর হ'তে পারে না। সৎ আমল আচরণের জন্য দৈহিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতাও একান্ত অপরিহার্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-الا ان فى الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب "জেনে রেখো! দেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যা ঠিক থাকলে গোটা দেহটাই ঠিক থাকে। আর সেটা নষ্ট হয়ে গেলে গোটা দেহটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে, সেই মাংসপিণ্ডটাই হচ্ছে অন্তরাত্মা।"

সুতরাং আত্মাকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখার সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। এজন্য আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিভিন্নভাবে তাকীদ করা হয়েছে। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা ও প্রশান্তি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমেই পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন-فشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا فى الليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام "তোমরা সালামের প্রসার কর, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাতে মনোনিবেশ কর; ফলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।"

তাক্বওয়ার ভিত্তিতে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে হাদীছে উল্লেখিত চতুর্বিধ দায়িত্ব পালন করতে পারলে জান্নাত লাভের আশা করা যেতে পারে। অনুরূপ প্রতিটি ইবাদতে উত্তম প্রতিদান লাভের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ মন মানসিকতা একান্ত অপরিহার্য। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাক্বওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন মন মানসিকতা গড়ে তোলার তওফীক্ব কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টিজনক কার্যাদি সম্পাদন করার পূর্ণ তওফীক্ব দান করুন! আমীন!

****

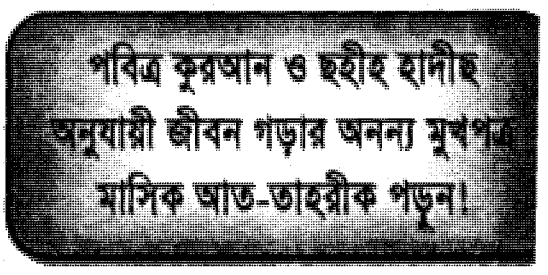

আল্লাহভীরু যুবকের পুরস্কার

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা)

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظلـه يوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشأ فى عبادة الله و رجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليـه و رجلان تحابا فى الله اجتمع عليـه و تفرق عليـه و رجـل ذكر الله خاليـا ففـاضت عينـاه و رجـل دعتـه امـرأة ذات حسب و جمال فقال انى اخاف الله و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه–

অনুবাদঃ ছাহাবী আবুহুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, "সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। (১) ইনছাফকারী ইমাম (২) ইবাদতে লালিত-পালিত যুবক (৩) যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, ইবাদত করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত (৪) ঐ ব্যক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে এবং পরস্পর আল্লাহর জন্যই একত্রিত হয় ও পৃথক হয়। (৫) আর যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু ঝরায় । (৬) ঐ (যুবক) ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী, বংশীয়া (নষ্টা) মহিলা (অপকর্মের জন্য) আহবান করে। যুবক বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) আর যে ব্যক্তি গোপনে ছাদক্বা করে, তার বাম হাত জানে না ডান হাতে সে কি খরচ করেছে" (বুখারী, মুসলিম)।

হাদীছের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ নবুওয়াতী দরসগাহের সরাসরি ছাত্র প্রখ্যাত ছাহাবী, হাফেযে হাদীছ হযরত আবুহুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত। মহাপ্রলয়ের পর মানুষ যখন বৃক্ষ-লতাহীন তৃণকুটা শূন্য সাদা ধপধপে হাশর মাঠে সমবেত হবে এবং সূর্যকে অতিসন্নিকটে আনয়ন করা হবে। যার প্রচণ্ড উত্তাপে মানুষ নিজ কর্মফলে ঘর্মাক্ত হ'তে থাকবে। তাদের ঘর্ম ৭০ গজ পর্যন্ত যমীনে বয়ে যাবে। এমনকি তা বৃদ্ধি পেয়ে কারো পায়ের টাখনু, কারো হাঁটু, কারো কোমর, কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সমস্ত মানুষ খাতনা বিহীন উলঙ্গ হয়ে উঠবে। এটা শুনে জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নারী-পুরুষ সবাই একত্রে উঠবে? কেউ কারো দিকে তাকাবে না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঘটনা এতই কঠিন হবে যে, কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবে না। কাফেররা সেদিন উল্টা দিকে মুখ করে মাথা ও মুখ দিয়ে হাঁটবে। সেই ভয়াবহ হাশর মাঠে দয়াময় মহান আল্লাহ্ যাদেরকে নিজ রহমতে আরশের নিচে ছায়া ও শান্তি দান করবেন, তারা কতইনা ভাগ্যবান! এই হাদীছে তাদেরই বর্ণনা এসেছে।

(১) ঐ ব্যক্তি যে ছিল দুনিয়াতে ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতা। অর্থাৎ রাজা-বাদশা, আমীর, সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ইনছাফকারী যে কোন নেতা আল্লাহ্পাক যে ইনছাফ বা আদলের নির্দেশ দিয়েছেন, তা সে যথাযথভাবে পালন করেছে। অবিচার, অনাচার, অত্যাচার সে করে নাই, হক্বদারের হক্ব নষ্ট কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয় নাই। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মুতাবেক সাধ্যানুযায়ী রাজ্য শাসন, প্রজাপালন, শরঈ হুদুদ ক্বায়েম করেছে, অথবা অনুশাসন চালিয়েছে। আল্লাহ্পাক তাকেই আরশের নিচে ছায়া দান করবেন।

(২) ঐ যুবককে যে বাল্যকাল হ'তে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে। যৌবনের সকল কামনা-বাসনা, অর্থ, সুখ-শান্তির উর্ধ্বে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই সে কেবলমাত্র মহাসম্পদ মনে করত। শরীয়ত বিরোধী কোন কর্ম যেমন- শিরক, বিদ'আত, সুদ,ঘুষ, লটারী, জুয়া, তাশ, পাশা, চুরি,ডাকাতি, লুটতরাজ, সন্ত্রাসী যে কোন অপকর্মে সে অংশগ্রহণ করতনা। এইরূপ দ্বীনদার চরিত্রবান আল্লাহ্ভীরু যুবকের জন্যেই আল্লাহ্পাক আরশের ছায়া দান করবেন।

(৩) ঐব্যক্তি যে মসজিদকে ভালবাসত। তার মধ্যে ইবাদত করার পর বের হয়ে গেলেও ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অন্তরকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রাখত। আল্লাহর ঘরকে এই ভালবাসার কারণেই আল্লাহ তাকে হাশরের মাঠে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

(৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবেসেছিল (বন্ধুত্ব করেছিল)। তাদের এ ভালবাসা দুনিয়ার কোন স্বার্থ, লোভ-লালসা বা আত্মীয়তার কারণে নয়, বরং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তারা ভালবাসা স্থাপন করেছিল, আল্লাহর জন্যই একত্র হ'ত এবং আল্লাহর জন্যই তারা পৃথক হ'ত। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে কামিল ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে ও আল্লাহর ওয়াস্তে দান করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা স্থাপন করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করে(মিশকাত)। এরূপ ভালবাসা স্থাপনকারীরাই আল্লাহর আরশের ছায়া লাভে ধন্য হবে।

(৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু ঝরায়। নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে আল্লাহর আযাব-গযবের ভয়ে কাঁদে। যারা আল্লাহর ভয়ে চোখের পানি ঝরায় তাদের কান্না বৃথা যাবেনা। দ্বীনদার লোক ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে যে, আল্লাহর ভয়ে

চোখের পানি ঝরায়। এরূপ ভীত ক্রন্দনকারী বান্দাকে আল্লাহ হাশরের মাঠে রহমতের ছায়া দান করবেন।

(৬) ঐ যুবক ব্যক্তিকে যাকে কোন সুন্দরী, বংশীয়া, চরিত্রহীনা, যুবতী প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু সে যুবক বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, এ পাপে অংশগ্রহণ করতে পারব না। কেননা তার জানা ছিল, ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য রয়েছে জাহান্নামের চরম শাস্তি। এ মর্মে শেখ সাদী উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

পেদার চুঁ দুর উমুরাশ মুনকাযা গাশ্‌ত,
মেরা ইঁ এক নছীহত করদু বুগজাশ্‌ত।
কে শাহওয়াত অতিশআস্ত আজু বিপরহিয,
বাখুদ বর আতাশে দোযখ মাকুন তীয।
দর আঁ আতাশে নাদারী তাকাতে সুয,
বাছর আবে বরইঁ আতাশে যান ইমরুয।

অর্থঃ "পিতার দীর্ঘ উমর শেষ হ'লে
এই উপদেশ গেলেন আমাকে বলে,
রিপুর অগ্নি হ'তে ক্ষান্ত থাক
নতুবা জ্বালানীর ন্যায় তোমার বাসস্থান দোযখ।
সে আগুনে জ্বলিবার নাই ক্ষমতা
ছবর বলে নিভাও প্রেমাগুণ হেথা"।

কয়জন আছে এরূপ চরিত্রবান যুবক? স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয়া একজন সুন্দরী, বংশীয়া যুবতী মহিলার আহ্বানে নিজকে রক্ষা করা সত্যই একজন চরিত্রবান আল্লাহভীরু যুবক ছাড়া আর কে পারে? তাই হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তাকে আরশের ছায়া দানে মহাসুখি করবেন।

(৭) ঐ ব্যক্তিকে যে গোপনে দান করে। অর্থাৎ রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) হ'তে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোপনে দান করে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই তার কাম্য, তাই সে এরূপ গোপনে দান করে। দয়াময় আল্লাহ্ তাকে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করে ধন্য করবেন।

পরিশেষে মহান করুণাময় আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকেও উপরোক্ত সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করার তাওফীক্ব দান করেন। আমীন!!

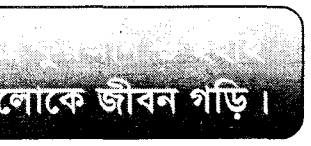

সামাজিক অনাচার ও তার কুফল

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান

ইসলাম একটি সুন্দর, কল্যাণকর, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। যে সব বস্তু ও কর্ম মানুষের জন্য অকল্যাণকর, যাঁ মানসিক শান্তি, শৃংখলা ও আর্থ-সামাজিক ভরসাম্য নষ্ট করে এবং যা ন্যায়-নীতি বিবর্জিত তা সামাজিক অনাচারের অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ- সূদ, ঘুষ, ধূমপান, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অসৎ সঙ্গ, ফিৎনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, হত্যা ইত্যাদি। নিম্নে এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সূদঃ সূদ-এর আরবী প্রতিশব্দ 'রিবা'-যার অর্থ বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত। অর্থাৎ প্রদত্ত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করাকে সূদ বলে।

সূদ প্রথার কুফলঃ সূরা বাক্বারার ২৭৫-২৮১ নং আয়াতে সূদের মারাত্মক কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, সুদখোররা শয়তানের স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট। সুদ হারাম। এরা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী। মহানবী (ছাঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সূদ লেনদেনের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদ চুক্তি লেখকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন (মুসলিম)। এই সূদের কারণে ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্রে পরিণত হয়। সমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ বৃদ্ধি পায়।

ঘুষঃ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর অর্পিত কাজের জন্য নিয়মিত বেতন পাওয়া সত্ত্বেও অসদুপায়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে উৎকোচ বা ঘুষ বলে।

এর কুফলঃ ঘুষের মাধ্যমে অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয় (বাক্বারা ১৮৮)। ঘুষদাতা ও গ্রহিতা উভয়েই জাহান্নামী। উভয়ের উপর আল্লাহ্ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর অভিসম্পাৎ। এর দ্বারা শুধু দুর্নীতির বিস্তারই ঘটে না বরং উন্নয়নের কাজও মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়।

ধূমপানঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান মারাত্মক বদ অভ্যাস। যা মানুষকে অপব্যয়ের দিকে ধাবিত করে। আর অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (বনী ইসরাইল ২৭)।

ক্ষতির দিকঃ ধূমপায়ী যক্ষা, দন্তক্ষয়, ক্ষুধামন্দা, গ্যাষ্ট্রিক, আলসার, ফুসফুসের ক্যানসার, হৃদরোগ, বিষবাত প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়ে। এ সম্পর্কে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হাসাপাতালের ফুসফুস বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক টেলিভিলেন বলেন, "ধূমপানের মত মানব সৃষ্ট মহামারী সভ্যতাকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে"।

মাদাকাসক্তিঃ মাদকাসক্তি একটি জঘন্য বদঅভ্যাস এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এটা অসংখ্য পাপ কার্য, অপরাধ ও

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

অসামাজিক কর্মের মূল। যে কোন প্রকার মাদকদ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম বা নিষিদ্ধ। যে দ্রব্য সুস্থ মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয় তা হারাম বা নিষিদ্ধ। যেমন- মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চয়ম, হেরোইন, মরফিন, কোকেন ইত্যাদি।

কুফলঃ মাদকদ্রব্য সেবন নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। আর শয়তান তো মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে মানুষকে বিরত রাখে (মায়েদা ৯০-৯১)। মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা (হাদীছ)। এতে হজম শক্তি বিনষ্ট হয়ে খাবারে অরুচি সৃষ্টি হয়। পেট বড় হয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। হৃদস্পন্দন ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। পরিণামে মদ্যপায়ী পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজ ও দেশের আশা-ভরসা ও সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তরুণ ও যুব সমাজকে ধ্বংস করার এক মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে মাদক।

জুয়াঃ কুরআনের ভাষায় জুয়াকে 'মাইসির' বলা হয়। শাব্দিক অর্থ সহজ উপার্জন। অন্যায়ভাবে ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যকে বঞ্চিত করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তা হ'ল জুয়া।

কুফলঃ এতে হক্বদার তার হক্ব থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ লটারীতে কারও নামে যখন অংশবিহীন শর ওঠে, তখন সে অংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এতে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়। বণ্টনের এ ব্যবস্থাটি ন্যায়-নীতি বিহীন ও নির্যাতনমূলক কাজ; এমনকি প্রতারণামূলকও বটে। এর দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় (মায়েদা ৯০-৯১)।

চুরিঃ কারও কোন সম্পদ না বলে নিয়ে গোপন করাকে চুরি বলা হয়। এটা মহাপাপের কাজ। চুরির জন্য ইসলাম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন, "নর ও নারী চোরের হাত কেটে দাও। যা তারা করেছে এটা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি" (মায়েদা ৩৮)। তবে অপরাধের পর যদি সে তাওবা করে এবং পরিশুদ্ধ হয়, তাহ'লে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন (মায়েদা ৩৯)।

ডাকাতিঃ বলপূর্বক প্রকাশ্যে ভীতি প্রদর্শন করে বা অস্ত্রের মুখে কারও টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পদ অপহরণ করাকে ডাকাতি বলে। এটা মারাত্মক যুলুম। মহানবী (ছাঃ) এ ব্যাপারে সাবধান করে বলেন, "সাবধান তোমরা যুলুম করবে না এবং স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।"

চুরি-ডাকাতির কুফলঃ এর ফলে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা থাকেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের জীবনও বিপন্ন হয়। মানুষের রাত্রের ঘুম হারাম হয়ে যায়, সমাজের শৃংখলা বিনষ্ট হয় এবং সমাজের সুদৃঢ় মায়ার বন্ধনে ফাটল ধরে। বৃদ্ধি পায় হিংসা, হানাহানি। সমাজে জ্বলে ওঠে অশান্তির অশান্ত দাবানল। মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে এসব বিনা পুঁজির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে নিজের ও সমাজের অকল্যাণ ডেকে আনে।

ছিনতাইঃ অন্যের জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া বা জোরপূর্বক হরণ করাই হ'ল ছিনতাই।

কুফলঃ ছিনতাইয়ের কারণে মানুষ ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে এমনকি বিমানেও তার জান-মাল, মান-ইযযতের নিরাপত্তা পায় না। এর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পসহ সমাজের সব ধরণের উন্নয়ন ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ছিনতাইকারীদের পরকালে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা একের জান-মাল ও সম্মান হরণ করা অন্যের জন্য হারাম (বাক্বারা ১৮৮)।

মিথ্যাচারঃ যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তারা প্রকৃত পক্ষে ঈমানদার নয় (নাহল ১০৫)। মিথ্যাবাদীর ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না (বুখারী)।

সত্য মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার মানুষকে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত করে (বুখারী ও মুসলিম)। মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে মিথ্যা বলা মুনাফিক্বের লক্ষণ (মিশকাত)। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। এমনকি রহমতের ফেরেশতারাও মিথ্যার দুর্গন্ধে তার থেকে অনেক দূরে চলে যায়।

প্রতারণাঃ কথা দিয়ে কথা না রাখা, মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, পণ্য-দ্রব্যের দোষ গোপন করা, কৃত্রিম মুদ্রা চালিয়ে দেওয়া, মাপে কম-বেশী করা, বেশী দামের জিনিসের সাথে কম দামের জিনিস মিশিয়ে দেওয়া, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি হচ্ছে প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

কুফলঃ প্রতারককে কেউ বিশ্বাস করে না। তার প্রতি কেউ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে না। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (তিরমিযী)। যে প্রতারণা করে সে মুনাফিক্ব। আর মুনাফিক্বের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে (কুরআন)।

অসৎ সঙ্গঃ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এমনই যে, কোন মানুষই পার্থিব জীবনে সঙ্গীর সাহচর্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এজন্য সঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন "হে মুমিনগণ! আমার এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" অসৎ সঙ্গীর সাথে চললে অসৎ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কথায় বলে- 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকিত্ব ভাল।'

ফিৎনা-ফাসাদঃ ফিৎনা-ফাসাদ হচ্ছে শৃংখলার চরম পরিপন্থী। পরিবার, সমাজ, অফিস-আদালত, শিক্ষাঙ্গন সর্বত্রই নিয়ম-শৃংখলার অভাব জাতির জন্য মারাত্মক

পরিণতি ডেকে আনে। নিয়ম-শৃংখলাহীন জীবন হালবিহীন নৌকার মত। শুধু তাই নয়, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পসন্দ করেন না (ক্বাছাছ ৭৭)। ফিৎনা-ফাসাদ অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আল্লাহ বলেন, "ফিৎনা-ফাসাদ হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাক্বারা ১৯১)।

সন্ত্রাসঃ সন্ত্রাস বিবেকহীন মানুষের অস্বাভাবিক ও পাশবিক আচরণের ফসল। সমাজে সৎ, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ও যোগ্য নেতা বা পরিচালকের অভাবে সন্ত্রাস দেখা দেয়। অসৎ নেতৃত্ব ও রাজনীতি সন্ত্রাসের মূল কারণ। সন্ত্রাসীরা জনমনে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়।

সন্ত্রাসের শাস্তি সম্বন্ধে আল-কুরআনের ঘোষণা, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হ'ল-তাদের হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এটা তাদের ইহকালের লাঞ্ছনা। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি" (মায়েদা ৩৩)।

হত্যাঃ সমাজে যত রকম অনাচার আছে হত্যা সেগুলোর মধ্যে একটি জঘন্য অনাচার ও অপরাধ। কোন মুসলমানকে বিনা অপরাধে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে তার দুনিয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (বাক্বারা ১৭৮-১৭৯)।

উপরোক্ত সামাজিক অনাচারগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকলে দুনিয়াবী জীবনে মানুষ সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়, সমাজে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অতএব মানব সমাজকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করে সচেতন হ'তে হবে। নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। এগুলির প্রতিকারের জন্য সমাজের সকলকে সচেতন হ'তে হবে, জাগ্রত হ'তে হবে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহ'লেই সমাজে আসবে কাঙ্খিত সুখ ও শান্তি এবং পরকালে সবাই পাবে মুক্তি।

অতএব আসুন! এসব সামাজিক অনাচার দূরীকরণে আমরা সবাই সোচ্চার হই! আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ হওয়ার এবং শক্ত হাতে তা প্রতিহত করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

❁❁❁❁❁❁❁

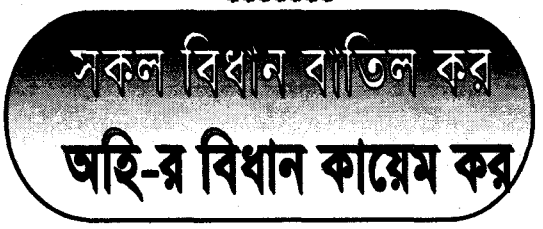

যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ সমূহ

-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রতিটি বস্তুরই একটি উৎকৃষ্ট অংশ বা শ্রেষ্ঠ সময় আছে। মানুষের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ হ'ল তার যৌবনকাল। যৌবনকাল মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বা সম্পদ। এ সময় মানুষের মাঝে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটে। যৌবনকালে মানুষের চিন্তাশক্তি (Thinking Power), ইচ্ছাশক্তি (Will power), মননশক্তি (Power of soul), কর্মশক্তি (Physical strength for working) প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। এককথায় এ সময় মানুষের প্রতিভা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এখন প্রশ্ন যৌবনকালে এত প্রতিভা, সাহস, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, উদ্দীপনা ইত্যাদি অপূর্ব গুণ কে দান করলেন? অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যখন আমরা এর উত্তর খুঁজব, তখন আমাদের মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে 'আল্লাহ্'। আমরা স্বীকার করব, এ সবই হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। এই অমূল্য নেয়ামত যথাযথ সংরক্ষণ এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করা সকল মুসলিম যুবকের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك-

"রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবকাশকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।"

উল্লেখিত হাদীছে বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে গুরুত্ব প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যুব সম্প্রদায়কে যৌবনকালকে মূল্যায়নের লক্ষ্যে স্বীয় বিবেক সদা-সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। যাতে করে কোন অন্যায়, অনাচার, পাপাচার, দুরাচার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যৌবনকালকে স্পর্শ করতে না পারে। অপরদিকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে যৌবনের উদ্যম ও শক্তিকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেন- انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله ذلكم خير

لكم ان كنتم تعلمون "তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সকল অবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা যদি তোমরা বুঝ' (তাওবাহ-৪১)।

অতএব আয়াতে তরুণ, যুবক ও বৃদ্ধ সকলের জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবানী করার কথা বলা হয়েছে। আর তাই তরুণ, যুবক ও বৃদ্ধ সবাইকে আল্লাহর পথে নিজ জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। আর এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ। এ নির্দেশ মান্য করা সকল মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব।

আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এখন প্রশ্ন এদেশের মুসলিম তরুণ ও যুবকরা নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন কি? আল্লাহর পথে তারা কি নিজ নিজ জান-মাল কুরবানী করছে? মানুষের কল্যাণে তারা কি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে? এর সন্তোষজনক উত্তর এদেশের যুবকদের কাছে আছে কি? আমি বলব, যুবকদের কাছে এর সন্তোষজনক উত্তর নেই। কারণ এদেশের অধিকাংশ যুবক বিপথগামী। তারা কল্যাণকর পথ ছেড়ে দিয়ে অকল্যাণকর পথ বেছে নিয়েছে। আলোর জগত থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকার জগতে হাতড়িয়ে মরছে। ফলে দেশময় নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটছে। সন্ত্রাস, ধর্ষণ, রাহাজানি ইত্যাদি নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম দীনতা বিরাজ করছে। তাহ'লে অবক্ষয়ের এই যুগে আমরা কি দেশে শান্তি, কল্যাণ বয়ে আনতে পারব? এক কথায় এর জবাব হচ্ছে, না। শান্তি, কল্যাণ বয়ে আনা সম্ভব নয়। কারণ যে জাতির যুবশক্তি দুশ্চরিত্রপরায়ণ সে জাতির ভাগ্যাকাশে কখনো কল্যাণের সূর্য উদিত হ'তে পারে না।

এখন প্রশ্ন আজকের যুবগোষ্ঠী কেন বিপথগামী? কেন তারা আলোর পথে না এসে অন্ধকার জগতে জীবন-যৌবনকে বিলিয়ে দিচ্ছে? এর কারণ বহুমুখী, যা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ পারিবারিকভাবে যুবক-যুবতীদের চরিত্র গঠনে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। দুনিয়াতে চলতে হ'লে কোন পথে চলতে হবে, কার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে, এ জগতসংসারে তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি, আখেরাতে মুক্তির জন্য তাকে কি করতে হবে, এসব বিষয়ে যুবমনে পারিবারিকভাবে জ্ঞান দান ও সাথে সাথে দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলা হয়-না। ফলে পারিবারিক দিক নির্দেশনার অভাবে এদেশের যুবকরা বিপথগামী হয়ে বেড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিকভাবে নৈতিক চরিত্র গঠনে যথাযথ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না, বরং চরিত্র ধ্বংসের বিভিন্ন কলাকৌশল এদেশে গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে যুবকরা চরিত্রহীন হয়ে গড়ে উঠছে।

তৃতীয়তঃ দেশে প্রচলিত নোংরা রাজনীতি আপামর জনসাধারণকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। বিশেষ করে যুবকরা এ নোংরা রাজনীতির শিকার। এ অসুস্থ রাজনীতির কবলে পড়ে যুবকরা আজ আদর্শহীন ভাবে বেড়ে উঠছে।

চতুর্থতঃ এ দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো যুবচরিত্র ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার। যেমন ইন্টারনেট, ডিশএন্টিনা, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা জগতের নগ্নতা এদেশের যুবচরিত্রকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে যৌন সুড়সুড়িমূলক সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা এদেশের যুবমনকে কলুষিত করে তুলছে।

পঞ্চমতঃ দেশে প্রচলিত ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এর জন্য কম দায়ী নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুবকদের নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন সুব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে সহশিক্ষার ফলে যুবক-যুবতীরা বিপথগামী হয়ে বেড়ে উঠছে। এককথায় নৈতিক শিক্ষার অভাবে যুবচরিত্র আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ যুবচরিত্র ধ্বংসের প্রধানতম কারণ হ'ল ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে যুবকরা আদর্শবান হিসাবে গড়ে উঠছে না। বরং আদর্শহীনভাবে অপরাধ জগতে বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। কেন মানুষ চরিত্রহীন ও দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠে, এ বিষয়ে Stanlly Hall-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তার অভিমত হ'ল- 'If you give their the three reading, writing and arithmetic and do not fourth religion, they are sure to become the fifth rascal.'

অর্থাৎ "শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ, লিখন ও অংক শিখালে এবং ধর্ম না শিখালে অবশ্যই তারা দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠবে।" সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে এদেশের অধিকাংশ যুবক আজ দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠছে।

এখন প্রশ্ন এ বিশাল যুবগোষ্ঠীকে আদর্শ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা কি আমাদের কাছে মওজুদ নেই? অবশ্যই মওজুদ আছে। আর তা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত অহিভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য যে, অহি-র শিক্ষাই মানুষকে চরিত্রবান, আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলে। তাই এ কল্যাণধর্মী অহিভিত্তিক শিক্ষাকে সর্বত্র প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সে সাথে চরিত্র বিধ্বংসী প্রচার মাধ্যমগুলো বন্ধের কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষা বাতিল করে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যদিকে রেডিও,

টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে, যাতে করে নগ্নতা, অশ্লীলতা প্রদর্শিত না হয়। এক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে যুবকদের চরিত্র ও আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলার। কারণ যুবকরাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ সোনালী সমাজের বাস্তব রূপকার। আর তাদের উপরেই নির্ভর করছে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। এ দায়িত্ব পালনে সামান্যতম ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে একটি জাতি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হ'তে পারে। কারণ ইতিপূর্বে বহু জাতি নৈতিক চরিত্রের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন- গ্রীক, মিশরীয়, ব্যবিলনীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সভ্যতা।

অপরদিকে অহি-র শিক্ষার সাথে সাথে যুবমনে আখেরাতের জবাবদিহিতাও জাগ্রত করতে হবে। কারণ আল্লাহ্পাক বিচার দিবসে মানুষের যৌবনকালের হিসাব গ্রহণ করবেন। যেমন হাদীছে এসেছে- وعن شبابه فيما ابـــلاه অর্থাৎ 'তুমি তোমার যৌবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছ'? এ প্রশ্ন আল্লাহ্পাক করবেন। তাই যৌবনকালের প্রতিটি কর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য যুবসম্প্রদায়কে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুতরাং যে সব যুবক তাদের যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে এবং তাঁর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হ'তে মহামূল্যবান পুরস্কার। এ ভাগ্যবান যুবকরা ক্বিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর বিশেষ রহমতের ছায়ায় স্থান পাবেন এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امـام عـادل و شاب نشـأ فـى عبـادة الله– 'সাত শ্রেণীর ভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের ছায়ায় স্থান পাবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে ঐ যুবক যে তার যৌবনকাল আল্লাহর পথে কাটিয়েছে।'

বলা আবশ্যক যে, যুবকদের মাঝে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করতে পারলেই সোনার বাংলা একদিন সোনার দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। তখন এদেশের যুবসম্প্রদায় বহির্বিশ্বে সন্ত্রাসী, চোর, ডাকাত হিসাবে পরিচিতি লাভ করবেনা; বরং আদর্শ ও চরিত্রবান জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। তাই যুবসম্প্রদায়কে ত্যাগের চিরন্তন ঐতিহ্য স্মরণ করে বিশ্ববাসীর কল্যাণে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কবির কণ্ঠে সেই ধ্বনি ঃ

"যে সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ করিল জয়,
তোমাদের বুকে লুকিয়ে রয়েছে তাহাদের পরিচয়।
বুকের দুয়ারে কুঠার হানিয়া জাগাও সে মহাবল,
তোমরা জাতির পথের দিশারী অশান্ত চঞ্চল।
তোমাদের হাতে ঝলসে উঠুক খসে পড়া শমসের,
তোমাদের কেহ সিংহশাবক, কেহ দুর্দম শের।"

অতএব যুবসম্প্রদায়ের কাছে উদাত্ত আহবান, আসুন! নিজের জীবন ও যৌবনকে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেই এবং পরকালে আল্লাহর নিকট প্রতিটি কর্মের হিসাব দেওয়ার প্রস্তুতি নেই। আল্লাহ আমাদেরে সবাইকে তার মনোনীত যুবশক্তি হিসাবে কবুল করুন। আমীন!!

****

এসো হে মুজাহিদ

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, সাতক্ষীরা

এসো বিপ্লবী সৈনিক, এস রেঁনেসার বীর মুজাহীদ,
অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কায়েম কর তৌহীদ।
জিহাদের নামে ধ্বংস নয়, ঈমানের জিহাদ কর,
ফের্কা,ইজম পরিত্যাগ করে রসূলের পথ ধর।
রাজনীতির নামে মানুষ হত্যা প্রকৃত জিহাদ নয়,
ঈমানের জিহাদই প্রকৃত জিহাদ, কর আল্লাহর ভয়।
সন্ত্রাস ও মানুষ হত্যা, নয় ইসলামী বিপ্লব,
জিহাদের নামে বিভেদ সৃষ্টি পছন্দ করেন না রব।
নবী-রসূলের পথ ওটা নয়, ও পথ ধ্বংসের,
শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে তুলে ধর তৌহিদী শমশের।
হাজার রকমের মূর্তিতে আজ রাষ্ট্র গেছে ভরে,
ইসলামের নামে মুসলিম ভাই মাযারে ওরশ করে।
মাযহাব-ফের্কা, গণতন্ত্র ও সব ভ্রান্ত মতবাদ,
ইসলামের নামে ও সবই ঈমান ধ্বংসের পথ।
ঈমান রক্ষার তরে,
এসো মুজাহিদ জিহাদী কাফেলা গড়ে তোল ঘরে ঘরে।
আহলেহাদীছ ডাক দিয়েছে না-রায়ে তাকবীর,
আর ঘুমিও না জেগে ওঠ, সব মুজাহিদ বীর।
আহলেহাদীছ যুবসংঘের বিপ্লবী কণ্ঠে শোন জিহাদের আহ্বান,
পথ ভুলে নয়, এসো রসূলের পথে, কর আহলেহাদীছ আন্দোলন।
জিহাদের পথই মুক্তির পথ, পাবে সুসংবাদ,
দুনিয়ার কোন সম্পদ নয়, পাবে পরকালে নাজাত।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

মৌলবাদঃ টার্গেট ইসলাম

-এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম'(আলে-ইমরান ১৯)। বর্তমান বিশ্বে যতগুলো ধর্ম আছে তার মধ্যে এমন কোন ধর্ম নেই যা ইসলামের সাথে তুলনীয়। ইসলাম হ'ল সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটা বৈজ্ঞানিক, সর্বাধুনিক, সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানবজাতির সার্বিক মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টিও ইসলাম। আর এটা এমন একটা ধর্ম যা গ্রহণের জন্য কোন প্রকার জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই। যার খুশী ইসলাম কবুল করে শান্তি, কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি লাভে ধন্য হ'তে পারে, অথবা ইসলামকে ইনকার (অস্বীকার) করে ইহকালীন জীবনে চরম অশান্তি, অকল্যাণ এবং পরকালে চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনাময় নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নাম বেছে নিতে পারে। আল্লাহ্‌ বলেন- لا اكراه فى الدين 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই'(বাক্বারাহ ২৫৬)। অথচ এই সুন্দর দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টান সহ পাশ্চাত্য অশুভ শক্তিগুলো আদাজল খেয়ে লেগে আছে এবং থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ চাইলে তারা ইসলামের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ বলেন- يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون 'তারা চায় নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে (ইসলাম) নির্বাপিত করতে অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে প্রজ্বলিত করবেনই, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে'(ছফ ৮)। শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও যখন ইসলাম তথা মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করতে পারল না, তখন তারা মুসলমানদেরকে অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকে। তেমনি একটা আধুনিক বিশেষণ হ'ল **'মৌলবাদ'**।

মৌলবাদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Fundamentalism। এ শব্দটি ১৯২০ সালে আমেরিকার খ্রীষ্টান সমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে খ্রীষ্টান ধর্মের চরম বিভক্তির মুখে একদল গোড়াপন্থিরা নিজেদেরকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এই শব্দটার সাথে মুসলমান তথা ইসলামের কোনরূপ সংশ্রব কোন কালে ছিল না, আজও নেই। কাজেই ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র তাদের একটা বহুল প্রচলিত (Fundamental) পরিভাষাকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ চাপানোর পেছনে আছে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাহ'ল একদিকে বিশ্বের দরবারে মুসলিম জাতিকে ঘৃণিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা, অন্যদিকে ইসলামের প্রকৃত ও নিঃশর্ত অনুসারীদেরকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে মুনাফিক্ব তৈরী করার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ভাবে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো এবং প্রতারণা, ভণ্ডামী ও আত্মহননের পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা।

মৌলবাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্পন্ন মনীষীদের দেওয়া সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মৌলবাদের সাথে ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই।। Webster's Dictionary-তে মৌলবাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে- "A belief that the Bible is to be accepted literally as an inherent and infallide spiritual and historical document; an early 20th century US protestant movement stressin this belief". অর্থাৎ "মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বাস, যার দৃষ্টিতে বাহির থেকে আক্ষরিক অর্থে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী বিশ শতকের প্রথম দিককার যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন।" Oxford Dictionary of Current English (A.S.Hornby) -এ 'Fundamentalism'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- "Maintenance of literal interpretation of the traditional beliefs of the Christian religion (such as the accuracy of every thing in the Bible) in opposition to more modern teachings." অর্থাৎ "তুলনামূলকভাবে বেশী আধুনিক শিক্ষার মোকাবেলায় খৃষ্ট ধর্মের সনাতন বিশ্বাসসমূহ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা (যেমনঃ বাইবেলে বর্ণিত সবকিছু যথার্থ) তাই মৌলবাদ। আর এটা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে মৌলবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়।" এছাড়া আরো অনেকেই মৌলবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল সকল মনীষীই তাঁদের সংজ্ঞাতে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে মৌলবাদের সাথে ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশে ৯০% লোক মুসলমান। তাই মৌলবাদ শব্দের সংজ্ঞা ও উৎপত্তির ইতিহাস যাই হৌক না কেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৌলবাদ মানে মুসলমান তথা ইসলাম। অর্থাৎ যারা নিজেদের বাস্তব জীবনে আল্লাহ্‌

ইসলামকে মেনে চলে তারাই মৌলবাদী। সুতরাং একথা আর বুঝতে বাকী নেই যে, মৌলবাদ বিরোধীদের লক্ষ্য ইসলাম।

চিন্তার বিষয়, ইসরাইল আধুনিক বিশ্বে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কট্টর ও গোঁড়া ধর্মবাদী (ইহুদী) রাষ্ট্র। অথচ পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের তথাকথিত নিরপেক্ষ (?) প্রচার মাধ্যমগুলো কি ঐ রাষ্ট্রকে একটা বারের জন্য হ'লেও মৌলবাদী আখ্যা প্রদান করেছে? বরং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সর্বতোভাবে তাকে নির্লজ্জ মদদ যুগিয়ে আসছে। আবার ইসলামকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই ঐ সকল প্রচার মাধ্যমগুলো মৌলবাদী আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। তাহ'লে কি আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না যে, উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক?

ইসলামের ক্ষেত্রে মৌলবাদ কথাটা আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ ইসলামে মৌল ও অমৌল, প্রকৃত ও কৃত্রিম, আধুনিক ও পুরাতন বলে কিছু নেই। ইসলামে যা কিছু বিশ্বাস, প্রস্তাবনা ও নির্দেশনা সবই মৌলিক, প্রকৃত ও আধুনিক। একথা শুধু মুসলমানরা নয়, পাশ্চাত্য মনীষীরাও স্বীকার করেছেন। ডঃ অসওয়েল জনসন বলেন-"কুরআনে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানগুলো এতই কার্যকরী এবং সর্বকালের জন্য উপযোগী যে, সব যুগের সকল দাবীই পূরণ করতে সক্ষম।"

ডঃ মরিস বুকাইলী বলেন- "The Quran does not contain a single scientifice statement that is unacceptable." "কুরআনে এমন একটি বক্তব্যও নেই,যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে।" তিনি আরো বলেন- "কুরআন ও বিজ্ঞানের সাথে যেখানে মতপার্থক্য সেখানে বুঝতে হবে বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।" তাছাড়া প্রায় সাড়ে ১৪শ বছরের ব্যবধানে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের একটি হরফেরও বিকৃতি ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না। সেকারণে মুসলমানদের মৌলবাদী বা অমৌলবাদী বলে গালী দেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

আজকে যারা 'মৌলবাদ নির্মূল কমিটি'র নামে দেশে আন্দোলন করে, তাদের নাম যতই ইসলামী হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের শত্রু। ইসলামী নাম তাদের আত্মরক্ষার মুখোশ মাত্র। কারণ কোন অমুসলিম মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন দিন কথা বলতে সাহস পাবে না। তাই এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব। উক্ত কমিটি (?) মনে করে ইসলামের প্রচলিত নিয়মগুলো সেকেলে, একালে তার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি হজ্জের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও তারা বাজে অর্থ ব্যয় বলে মনে করে এবং যারা এগুলো করে তাদেরকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। অথচ রাজনৈতিক দলের নেতারা মুসলমান এবং তারা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের মত ইবাদতগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকেন। তাহ'লে কি তাদের দৃষ্টিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীও মৌলবাদী? আসলে মৌলবাদী মানে আজকের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে তারা বুঝায় না। বরং গোটা মুসলিম জাতিকে বুঝায়। সে কারণে দাউদ হায়দার, আলাউদ্দীন, হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ, কবির চৌধুরী, তাসলিমা নাসরিনের মত কুখ্যাত মুরতাদদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে উক্ত কমিটি তাদের নির্বিচারে মৌলবাদী বলে প্রকাশ করে। **'শিখা চিরন্তন', 'শিখা অনির্বাণ'** নামে প্রকাশ্য অগ্নিপূজার বিরুদ্ধে কথা বললে, মসজিদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শেখ মুজিবের ছবি না টাঙ্গালে মৌলবাদী আখ্যা পায়।

মৌলবাদ বিরোধী কারা এটা একবার আমাদের তলিয়ে দেখা দরকার। শাব্দিক অর্থে মূল মতবাদে বিশ্বাসীরাই মৌলবাদী। পক্ষান্তরে এর বিরোধীদের নাম নিঃসন্দেহে ভেজালবাদী। বাস্তবে তাই মৌলবাদ বিরোধীরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ফ্রয়েড, চার্লস ডারউইন, এঙ্গেলস, লেলিন, মাওসেতুং, হিটলার, গ্যাবল, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখদেরকে অনুসরণ করে। তাদের দর্শনাদর্শে বিশ্বাসী ও লালিত-পালিত মৌলবাদ বিরোধীদের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্র হয়ে পড়েছে অত্যন্ত কলুষিত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তাই সময় এসেছে মৌলবাদ বিরোধের নামে মুসলমানদের উৎখাতের কাজে যারা নিয়োজিত তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার।

অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে মৌলবাদ মুসলমানদের জন্য একটা উপযুক্ত বিশেষণ। কারণ সাড়ে ১৪শ বছর আগে যে ইসলাম ছিল এখনো তাই আছে, ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। এটা সকল ধর্মের উপর ইসলামের এক সার্বজনীন চ্যালেঞ্জ। সেকারণে আজকের মুসলমানরা যেটা অনুসরণ করে সেটাই আসল, সেটাই মূল। আর সর্বদা মূল বিষয়টা অনুসরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (ছাঃ)-এর জোর তাকীদ রয়েছে। সুতরাং মৌলবাদ শব্দটা মুসলমানদের জন্য গালির মত করে উচ্চারণ করলেও শব্দ হিসাবে এটা খুব খারাপ শুনায় না। অমৌলবাদী তথা ভেজালবাদী হওয়ার চেয়ে মৌলবাদী হ'তে পারাটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের একটা গর্বের বিষয় বৈকি!

প্রকৃত মুসলমান মাত্রই অহি-র সন্ধানী। তাই মৌলবাদী পরিচয়ে তাঁর আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই বরং অহংবোধ করাই শ্রেয়। এতে পাশ্চাত্য ও তাদের গংরা ভীষণভাবে হতাশ হবে এবং আরোপিত গ্লানিবোধ থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্তি পাবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব

-মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক

মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর ঘোষণা- وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون পরন্তু দুনিয়ার এই জীবনই চূড়ান্ত নয়। মানুষের আর একটি অবিনশ্বর জীবন আসবে, যখন মানুষকে আল্লাহর সম্মুখে ইহজীবনের যাবতীয় কাজের এমনকি আমাদের কাছে খুটিনাটি বিষয় তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। আর সে অনুযায়ী মানুষ পুরস্কার কিংবা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. অর্থাৎ "কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে"(যিলযাল ৭-৮)।

এই পৃথিবীতে সত্যের, ন্যায়ের এবং পুণ্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, আর অন্যায়, পাপ ও যুলুমের বিলোপ সাধন করাই মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। আল্লাহ বলেন- كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله– "তোমরাই উত্তম জাতি, মানব সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যময় কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়, পাপ ও মন্দ কাজ হ'তে লোকদেরকে বিরত রাখ। আর আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ" (আলে-ইমরান ১১০)।

মানবজীবনের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাকে অনেক ত্যাগ, তিতীক্ষা ও কুরবানীর পরিচয় দিতে হয়। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের কঠিন সংগ্রামে মানুষকে জান ও মালের বাজি রাখতে হয়। রক্ত ছাড়া যেমন দেহ চলে না তেমনি অর্থ ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলতে পারে না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক ক্ষেত্রে জীবনের চেয়ে মালের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة– "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্রয়করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে" (তওবা ১১১)।

জান্নাত প্রাপ্তি মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত বাসনা ও আশা-আকাংখার লক্ষ্যস্থল। জান্নাতই হ'ল একজন মুমিনের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা। এই জান্নাত অর্জনের জন্য বিনিময় স্বরূপ সর্বোত্তম ত্যাগ বা কুরবানী করতে হয়। মানুষ সবচেয়ে ভালবাসে তার জীবন ও সম্পদকে। সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحيواة الدنيا والله عنده حسن المأب. "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাশি, গবাদীপশু এবং ক্ষেত-ক্ষামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল [জান্নাত]" (আলে ইমরান ১৪)। মানুষের এই সর্বোত্তম আকর্ষণীয় বস্তু নিবেদনের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে পরকালীন জীবনের সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল জান্নাত।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবনকে স্বার্থক ও সুখময় করার জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ বলেন, الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. "যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে অতঃপর বলে বেড়ায় না এবং খোটা দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে"(বাক্বারাহ ২৬২)।

আল্লাহপাক দুনিয়া পরিচালনার স্বার্থে অর্থ সঞ্চয়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে খরচের প্রবণতাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই সঞ্চয় ও ব্যয় যখন সঠিক ও সৎ পথে হয় তখন তা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির অসীলা হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মাল ও জান দিয়ে সংগ্রাম করাকে আল্লাহ তা'আলা পরকালীন মুক্তির উপায় বলে উল্লেখ করেছেন। يايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি এমন একটা ব্যবসার কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ" (ছফ ১০)।

এই আয়াত হ'তে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালে মুক্তির জন্য জান ও মালের বিনিময়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম ঈমানদারদের জন্য উত্তম বাণিজ্য। এই বাণিজ্যে ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সফল সওদাগর, ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক কুরবানীর তাকীদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

قل لعبادى الذين امنوا يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقناهم سرا و علانية من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلل. "আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দাও! তারা যেন ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক্ব দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে গোপনে ও প্রকাশ্যে সেই দিন আসার পূর্বে, যে দিন কোন কেনাবেচার সুযোগ থাকবেনা" (ইবরাহীম ৩১)। আল্লাহ আরও বলেনঃ وانفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. "খরচ কর আল্লাহর রাস্তায়। নিজের হাতকে (নিজকে) ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। উত্তম রূপে নেক কাজের আঞ্জাম দাও। নিশ্চয় আল্লাহ নেক কাজে আঞ্জাম দানকারীদের ভালবাসেন" (বাক্বারাহ ১৯৫)।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অর্থ কুরবানীর প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন "যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ সমূহ ব্যয় করে তাদের ঐ সম্পদের তুলনা একটি শস্যদানার মত যেখান থেকে সাতটি শীষ নির্গত হয়। প্রতিটি শীষে একশতটি দানা হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বর্ধিত করে থাকেন। আল্লাহ উদার হস্ত ও মহাবিজ্ঞ"(বাক্বারাহ ২৬১)। অনুরূপভাবে মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله انفق يا ابن ادم انفق عليك. হযরত আবুহুরাইরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)বলেছেন- "আল্লাহ তা'আলা মানবসন্তানকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তুমি খরচ কর তাহ'লে তোমার জন্য খরচ করা হবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم . "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা এবং তোমাদের যবান দ্বারা" (আবুদাউদ)।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস যাকাত। এই যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি দু'টি খাত নির্দিষ্ট। এক "المؤلفة قلوبهم" দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার স্বার্থে মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য। দুই "وفى سبيل الله" 'আল্লাহর পথে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহর নির্দেশিত পথে, প্রত্যেক জনকল্যাণকর কাজে, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হ'তে হবে। পরকালীন স্বার্থে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের প্রতিযোগিতায় দ্বিধাহীনচিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ছাহাবায়ে কেরামের আর্থিক কুরবানী থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর সঞ্চিত অর্থ অকাতরে উৎসর্গ করে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন, যা মুসলিম হৃদয়ে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বিরাজিত থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছাহাবায়ে কেরামগণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই বাপ-দাদার ভিটা-মাটিতে গড়ে তোলা সম্পদরাজী, ব্যবসা-বাণিজ্য নির্দ্বিধায় ফেলে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন শুন্য হাতে মদীনার পানে। অন্যদিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে মোটেও কার্পণ্য হয়নি নওমুসলিম মদীনাবাসীদের কি অপূর্ব ত্যাগের ইতিহাস!

হযরত আবুবকরের হাতেই মুক্ত হ'ল দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ কুরাইশ অত্যাচারে ক্লান্ত বেলাল, খাব্বাব, সুমাইয়া, সুহাইব প্রমুখ। আজও তাওহীদী আন্দোলন অর্থাভাবে শৃঙ্খলিত। এ শৃংখল মুক্ত করার জন্য আপনার কাছে সঞ্চিত আল্লাহর দেয়া অর্থ ব্যয় করতে হবে। যেমন- ওমর, ওছমান, আলী ও অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের ত্যাগে বদর, ওহুদ, খন্দক, তাবুকে সৃষ্টি হয়েছে অনুপম দৃষ্টান্ত। যার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস আমাদেরকে সদা অনুপ্রাণিত করছে। তাঁরা চেয়েছিলেন জান ও মালের বিনিময়ে জান্নাত খরিদ করতে।

আজও মুসলমানদের সম্পদ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, মুসলমানের সম্পদ ব্যয় হয় দুনিয়া হাছিলের কাজে; ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আতের কাজে, শিরকী গণতান্ত্রিক নির্বাচনে। অথচ সর্বত্রই অনাহারি বনু আদমের নিষ্ফল চাহনী। আর এই সুযোগ গ্রহণ করেছে ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র। তারা দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে এন. জি. ও.-দের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদা নষ্ট করছে। তারা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে দরিদ্র মুসলমানদের ইসলাম চ্যুত করার মিশনারী অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। অথচ বিনিময়ে পরকালে তারা কিছুই আশা করেনা। আর যাদের অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে জান্নাতের ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের অর্থ ব্যয় হয় তাগুতের পথে, ফ্যাশনশোর রঙ্গ-মঞ্চে। আপনার আয় ও ব্যয় দু'টিরই হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে। তাই সম্পদের সঠিক হিসাব দেয়ার জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, ক্ষুধিত মানবতাকে সূদমুক্ত ঋণ দিয়ে সূদীকারবারীদের শোষণ হ'তে রক্ষা করতে হবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রয়োজন। এজন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করতে হবে। আপনার সম্পদ যেন ক্বিয়ামতে আপনাকেই দংশনকারী অজগর না হয়, সে সম্পর্কে সতর্ক হ'তে হবে। সেদিন হিসাব না দিয়ে এক পাও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই সম্পদের সঠিক হিসাব দেয়ার জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদী আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। আপনার দানের মধ্যেই আল্লাহর রহমত নেমে আসবে; দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

পরিশেষে বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীতে উদ্ধৃত রাসূল (ছাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যৎ আশংকাকে স্মরণ করাতে চাই- انى لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكنى اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها "হে আমার অনুচরগণ! আমি এ আশংকা করি না যে, তোমরা আমার ইন্তিকালের পরে মুশরিক হয়ে যাবে, বরং আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করবে।" অর্থাৎ আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজনীতা অনুভব করবেনা। আল্লাহ আমাদের দুনিয়াকে প্রাধন্য না দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক কুরবানী করার মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

****

হুতাশন দমন

-ইমামুদ্দীন
নওদাপাড়া মাদ্রাসা, রাজশাহী।

হুতাশন ধিকি ধিকি জ্বলছে নিভানোর কিছু নাই,
নিরব খাকিয়া আগুনে কি সব হয়ে যাবে ছাই ?
ঐ পাষন্ডরা হুতাশনের পার্শ্বে বসিয়া অলক্ষ্যভাবে
ফুঁদিয়া বাড়িয়ে দিচ্ছে হুতাশনের তেজ।

যদি তুমি হও সত্যের সৈনিক তাহলে সিন্ধু থেকে
নিয়ে যাও সলিলের ঊর্মি ধ্বংস হোক অনলের ফুলকি।
ঐ পাষন্ড অরতির বিরুদ্ধে কষে ধর শমশের,
ছিন্ন ভিন্ন করে দাও বৈরীদের। তবে পাবে শান্তি!

তারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় ইসলামের প্রতীক,
তাই বলে তুমি হয়োনা শংকিত, হও নির্ভীক।
কৃপান দিয়ে নিচু করে দাও ঐ অহংকারী শির,
তাহ'লে অনলে পুড়বেনা তোমার শান্তি প্রিয় নীড়।

****

...ক্তির একই ... 'ওয়াত ও জিহা...

আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে

-ইবনু আব্দিল মান্নান

এক আল্লাহ, এক নবী, এক কুরআন ও এক কা'বার অনুসারী হ'য়েও মুসলিম জাতি আজ শতধাবিভক্ত। "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না (আলে-ইমরান ১০৩)।" আল্লাহর এ আদেশকে উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন মাযহাব, তরীক্বা ও ইজমের অনুসারী হয়ে অখণ্ড মুসলিম মিল্লাতকে শতভাগে বিভক্ত করেছে। ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকেও কোন কোন ক্ষেত্রে পদদলিত করে অনুসরণীয় ইমাম, মাযহাব বা তরীক্বার আদেশ-নিষেধকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। ফলে প্রকৃত ইসলাম হ'তে দূরে সরে গিয়ে মুসলিম জাতি সারা বিশ্বের সর্বত্রই হচ্ছে লাঞ্ছিত, অপমাণিত ও অত্যাচরিত। অথচ একদিন তারা অর্ধপৃথিবী শাসন করছিল। তাদের সম্মানও ছিল সর্বত্র। তাদের ঐক্য-সংহতিতে অন্যান্য জাতি বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেই মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দলবিভক্তির এই বিদ'আত শুরু হয় হিজরী চতুর্থ শতকে। ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর উক্তিতে যা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, "জেনে রেখো যে, চতুর্থ শতকের পূর্বে লোকেরা কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করতো না" (হুজ্জাতুল্লাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০)। কিন্তু চতুর্থ শতকে মুসলিম মিল্লাতের লাবণ্যময় দেহে ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা ও জাতিহন্তার মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এই মহামারিরই কুফল হচ্ছে ৬৫৬ হিজরীতে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাগদাদের কেন্দ্রীয় খেলাফত ও তৎকালীন বিশ্বের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার বাগদাদের গ্রন্থাগার ধ্বংস এবং ৮০১ হিজরীতে সুলতান ফরজ বিন বির্ক্বক কর্তৃক কা'বা শরীফে এক মুছল্লার স্থলে চার মাযহাবের চার মুছল্লা প্রতিষ্ঠা।

এসব ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, দলবিভক্তি বা ফের্কাবন্দী মুসলিম জাতির ঐক্য সংহতিকে বিনষ্ট করেছে এবং তার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়ে তাকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দিয়েছে। ফলে সারা বিশ্বে আজ মুসলমানরা লাঞ্ছনার দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। কিন্তু ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এমন একটি দল বা জামা'আত ছিল, যারা এ অনৈক্যের বিরোধী ছিল এবং মুসলিম জাতিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার ও থাকার আহবান জানিয়ে আসছিল। এ দলটি অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। মূলতঃ এঁরাই 'আহলেহাদীছ'। এঁদের সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

আহলেহাদীছের পরিচয়ঃ ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' ও আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুলহাদীছ' অর্থ 'হাদীছের অনুসারী'। প্রচলিত অর্থে কুরআন ও হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারীকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীক্বা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।

আহলেহাদীছগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন এবং তাদের নিকটে কোন সমস্যার উদ্ভব হ'লে তারা সর্বপ্রথমেই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকেন।

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে Encyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছেঃ AHL-I-HADITH: The Followers of the prophetic traditions, who profess to hold the same as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al-hadith (as opposed to Ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by 'Taqlid'....but consider themselves free to seek guidance in mathers of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims.

The Ahle hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. অর্থাৎ "আহলেহাদীছ বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলেহাদীছ বা আছহাবে হাদীছের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীত)। যারা তাক্বলীদের বন্ধন স্বীকার করেন না। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করেন। আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান।"

পণ্ডিত Titus Murray বলেনঃ "Whatever the prophet Muhammad taught in the Quran and the authoritative Traditions (Ahadith Sahih), that alone is the basiss of the religion known as the Ahl-i-hadith. The tenets of the sect give clear exppression to the zeal which seeks to go back to first principles and to restore the original simplicity and sincerity of faith and practice." "কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, একমাত্র তাকেই যারা ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, তারাই হ'লেন 'আহলেহাদীছ'। ইসলামের প্রথম যুগের মূলনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার মৌলিক সরলতা, আক্বীদা ও আমলের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।" ঠিক তেমনিভাবে S.M. Zwemer বলেনঃ "Their main object is to get rid of the authority of the four schools, Inorder to adjust Islam to modern conditions. They go back to the Kuran and the Traditions, not out of blind veneration for the past, but inorder to vindicate a great freedom over against the requirements of the modern world."

"আহলেহাদীছ-এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রচলিত চার মাযহাবের বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভ করা, যাতে করে ইসলামের আধুনিক যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে যেতে চান কেবল অতীতের প্রতি অন্ধ আবেগবশে নয় বরং আধুনিক পৃথিবীর প্রয়োজন পূরণে অধিকতর স্বাধীনতা লাভের জন্য।"

বস্তুতঃ আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয় বরং যাঁরা শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই জীবন চলার পথে দিক নির্দেশনা হিসাবে মেনে নেন এবং এতদুভয়ের আদেশ-নিষেধকে সব কিছুর উপরে স্থান দেন ও তদানুযায়ী আমল করেন তাঁরাই আহলেহাদীছ বলে অভিহিত হবেন।

যুগে যুগে আহলেহাদীছঃ অনেকের ধারণা প্রচলিত চার মাযহাবের ন্যায় আহলেহাদীছও একটি মাযহাব, যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আন-নাজদী। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা আহলেহাদীছগণ কোন মাযহাব বা ব্যক্তি বিশেষের অনুসারী নন; বরং আহলেহাদীছগণ মহানবী (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী। আর এই নামও স্বয়ং রাসূলের দেয়া, যা রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে এসেছে।

নিম্নের হাদীছ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণঃ عن ابى سعيد الخدرى رضـ انه اذا راى الشاب قال مرحبا بوصيـة رسـول الله صلعـم امرنـا رسـول الله صلعـم ان نوسـع لكـم فـى المجـالس وان نفـهمكم الحديـث فـانكم خلوفنـا واهـل الحديـث بعدنـا. "হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি কোন যুবককে দেখতেন তখন বলতেন, 'রাসূলুল্লাহর (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের জন্য মজলিসে জায়গা করে দেওয়ার এবং তোমাদেরকে হাদীছ বুঝানোর জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন। কারণ তোমরা আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং পরবর্তী আহলেহাদীছ" (শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ১২; মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮)।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ নামটি স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া। পক্ষান্তরে কুরআনের দেওয়া নাম হচ্ছে 'মুসলিম'। মূলতঃ 'মুসলিম' ও 'আহলেহাদীছ' নামদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ মুসলিম তিনি যিনি, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে তাঁর সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করেন। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। তাই আহলেহাদীছ ও মুসলিম নামদ্বয় মূলতঃ একই। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, শী'আ, মুরজিয়া, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলা ইত্যাদি অসংখ্য দলে বিভক্ত। এই সব দল মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য-সংহতিকে ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। অথচ এরা সবাই মুসলিম নামে নিজেকে পরিচয় দিতে ব্যস্ত। যদিও এদের কোন কোন দল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিরক, বিদ'আত ও কুফরের মত জঘন্য পাপেও লিপ্ত। তাই মুসলিম জাতি তাঁদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য যুগে যুগে নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচয় দিয়ে আসছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায়ের পথে তথা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে মানুষকে ডেকেছে; শতছিন্ন মুসলিম জাতিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছে। এই আহলেহাদীছ জামা'আত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হ'ল।

হিজরী ১ম শতকে আহলেহাদীছঃ সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবুহুরায়রাহ (রাঃ) নিজেকে গর্বভরে 'আহলেহাদীছ' বলতেন। তিনি বলতেনঃ انا أول صاحب حديث فى الدنيا "আমিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ" (ইছাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬; তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২; তারীখে বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৭)। যে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের দ্বীনের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মহানবী স্বয়ং দো'আ করেছিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে আহলেহাদীছ বলা হয়েছে (তারীখে বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ২২৭; তাবাকাতে যাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩)। বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম শা'বী যিনি ৫০০ ছাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন এবং ৪৮ জন ছাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث قال الذهبى يعنـى بـه الصحابـة رضـ অর্থাৎ "যে সব মাসআলায় আহলেহাদীছগণ একমত হয়েছেন আমি কেবল সেই সব হাদীছগুলো বর্ণনা করেছি।" হাফেয যাহাবী বলেন, ইমাম শা'বীর উক্তিতে 'আহলেহাদীছ' শব্দ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের দলকে বুঝানো হয়েছে।" (তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃঃ৭৭)। অতএব বুঝা যায় ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগেও আহলেহাদীছ পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল।

মিসর, সিরিয়া, আযারবাইজান, আলজেরিয়া, স্পেন, আবিসিনিয়া, রোম, পারস্য, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যেসব মহামনীষী ইসলামের মশাল বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেউই প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসারী কিংবা শী'আ, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযেলা, মুরজিয়া বা অন্য কোন দলের অনুসারী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মনীষী আবুমানছূর বাগদাদী লিখেছেনঃ ثغور الروم والجزيرة والشام وازربيجان وباب الابواب كل اهلها كـانوا علـى مذهـب اهل الحديث كذلك ثغور الافريقية واندلس وكل ثغر وراء بحـر المغرب كل اهلهاكانو من اهل الحديث وكذلك ثغور اليمن علـى ساحل الزنـج كـان اهلـها مـن اهـل الحديـث. অর্থাৎ রোম, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান ও বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের মুসলিম উপনিবেশ সমূহের অধিবাসীগণ আহলেহাদীছ ছিলেন। তদরূপ আফ্রিকা, স্পেন ও পশ্চিম সাগরের পিছন দিকের দেশসমূহের মুসলিম উপনিবেশগুলোর অধিবাসীরা আহলেহাদীছ ছিলেন। এইরূপ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্তী ইয়েমেনের সমস্ত সীমান্তবাসীগণও 'আহলেহাদীছ ছিলেন' (উছূলুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭)। অতএব বুঝা যায়, হিজরী ১ম শতকে আহলেহাদীছ ছিল।

হিজরী ২য় শতকে আহলেহাদীছঃ হানাফী ফিক্হ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'দুররুল মুখতার'-এর প্রণেতা লিখেছেন ইমাম আবুহানীফার (রহঃ) যুগে আহলেহাদীছের অস্তিত্ব ছিল (দুররুল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩০)। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেনঃ يلقانى الرجال واصحاب الحديث منهم احمـد بـن حنبـل وسفيان بن عيينة واوزاعـى 'আমার সাথে সাধারণ লোক

ও আহলেহাদীছদের সাক্ষাৎ হ'ত। তন্মধ্যে কতিপয় হ'লেন আহমাদ ইবনু হাম্বল, সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ ও আওযাঈ প্রমুখ' (রাহলাতুশ শাফেয়ী, পৃঃ ১৪)।

হযরত আবুসাঈদ খুদরির ছাত্র তাবিঈগণ এবং ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম শাফেঈ সবাই ছিলেন হিজরী ২য় শতকের লোক। উল্লেখিত তিনটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় শতকেও বহু আহলেহাদীছ বাগদাদ, কূফা, সিরিয়া, মক্কা, মদীনাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয় শতকে আহলেহাদীছঃ ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ তিরমিযীতে 'আহলেহাদীছ' ও 'আছহাবুলহাদীছ' শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। শামী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্রের ছাত্র আবুবকর আল-জাওজানীর বিচারপতি থাকাকালে একদা এক হানাফী এক আহলেহাদীছের কন্যাকে তার পুত্রের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আহলেহাদীছ লোকটি বলল যে, আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের সাথে এ শর্তে বিয়ে দিতে পারি যে, আপনি হানাফী মাযহাব ছেড়ে দিবেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বেন, রুকূতে যাবার সময় রফউল ইয়াদায়ন করবেন। এভাবে আহলেহাদীছের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি পালন করবেন। তখন সে হানাফী লোকটি এ শর্তগুলি মেনে নেয় এবং আহলেহাদীছ লোকটি হানাফী লোকটির পুত্রের সাথে স্বীয় কন্যার বিয়ে দেয় (শামী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪, বাবুত তা'যীর)।

ইমাম তিরমিযী ও বিচারপতি আবুবকর উভয়েই তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী তৃতীয় শতকেও 'আহলেহাদীছ' নামে একটি স্বতন্ত্র জামা'আত ছিল এবং তারা অন্যকে নিজেদের মতে দীক্ষিতও করত।

চতুর্থ শতকে আহলেহাদীছঃ মুসলিম মনীষা গ্রন্থ প্রণেতা বিচারপতি আবদুল মওদূদের মতে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির ভৌগলিক বর্ণনায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম ভূ-তত্ত্ববিদ হ'লেন আল-মাক্বদেসী। তিনি ৩৭৫ হিজরীতে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি সিন্ধুর মান্ছূরা (করাচী) নামক স্থান সম্পর্কে লিখেছেনঃ اكثرهم اهل الحديث। 'এখানকার অধিকাংশ (মুসলিম) অধিবাসী আহলেহাদীছ' (আহসানুত তাক্বাসীম, পৃঃ ৪৮১)। সুতরাং মাক্বদেসীর এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ শতকেও আহলেহাদীছ ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে আহলেহদীছঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের মনীষীকুল শিরোমণি আবদুল ক্বাদের জিলানী (রহঃ) (জন্ম ৪৭০হিঃ-মৃত্যু ৫৬১হিঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন'-এ আহলেহাদীছদের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের তিয়াত্তর ফের্কার মধ্যে নাজী ফের্কা (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেনঃ

اهل السنة لا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحديث.

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি মাত্র নাম আছে আর তাহ'ল **আহলেহাদীছ**"(গুনিয়া, করাচী ছাপা, পৃঃ ৩০৯-১০)। তাপস প্রবর বড় পীর-এর মন্তব্য দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও আহলেহাদীছ ছিল।

হানাফী মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিক্হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে লেখা আছেঃ "ইজমা আছে যে, আহলেহাদীছ সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত এবং হক্বের (সত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ইক্তিদা (অনুসরণ) করা হানাফীদের জন্য জায়েয" (হিদায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৮)। এ গ্রন্থটি ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৬৮ হিজরীতে) রচিত হয়েছে। সুতরাং হিদায়ার উল্লেখিত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, ৬ষ্ঠ শতকেও আহলেহাদীছ ছিল।

হিজরী ৭ম ও ৮ম শতকে আহলেহাদীছঃ হিজরী ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর বিশ্ববরেণ্য মনীষী হাফেয ইবনুল ক্বাইয়েম (৬৯১-৭১৫হিঃ) চার মাযহাবের কোন একটি বিশেষ মাযহাবের তাক্বলীদ করাকে 'বিদ'আত' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, انما حدثت هذه البدعة فى القرن الرابع المذمومة على لسانه صلى الله عليه وسلم.

"হিজরী ৪র্থ শতকে এই মাযহাবের তাক্বলীদ করা 'বিদ'আত' চালু হয়েছে। এটা সেই যুগ যার নিন্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) রসনা হ'তে নিঃসৃত হয়েছে"(ইলামুল মু'আক্কেঈন, দিল্লী ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২)। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়েমের মন্তব্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেও এমন বহু লোক ছিলেন যারা চার ইমামের কোন এক বিশেষ ইমামের তাক্বলীদ করাকে 'বিদ'আত' মনে করতেন। যা আহলেহাদীছের বিশেষ ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হিজরী ৭ম ও ৮ম শতকেও আহলেহাদীছগণ তাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে রেখেছিল।

হিজরী ৯ম ও ১০ শতকে আহলেহাদীছঃ ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রাণী (মৃত্যু ৯৭৩হিঃ) চার মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার সময় হ'তে স্বীয় যুগ পর্যন্ত আহলেহাদীছ আলেমদের এক বিরাট দলের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না (ইক্বদুল জীদ, পৃঃ ৯৮)। ইমাম শা'রাণী ছিলেন দশম শতাব্দীর লোক। সুতরাং তাঁর এ তালিকা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী নবম ও দশম শতকেও আহলেহাদীছ ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলছিল।

হিজরী ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকে আহলেহাদীছঃ ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫৫হিঃ) লিখেছেন, 'শুধু আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে সৈয়দ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর

সান'আনীকে (১০৯৯-১১৪২হিঃ) বিরোধীদের হাতে অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল" (আল-বাদরুত তালে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৭)। তিনি আরো লিখেছেন যে, "তাঁর যুগে অন্যান্য দেশের মত ইয়েমেনেও অনেক আহলেহাদীছ ছিলেন" (ঐ; তরীক্বায়ে মোহাম্মাদী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০)। ইমাম শাওকানী হিজরী ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীর লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁর উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিজরী ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতকের পূর্বেই আহলেহাদীছ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিজরী ১২শ ও ১৩ শতকে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের সে মহান মনীষীও জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁর সম্পর্কে প্রাচ্যের দার্শনিক, ইসলামের দৃপ্ত নকীব মহাকবি ইকবাল বলেছেনঃ ভারত এ পর্যন্ত একজন প্রকৃত আলেমের জন্ম দিয়েছে এবং তাঁর নাম ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬হিঃ) (রঃ) [মুসলিম মনীষা, পৃঃ ২৫৭]। প্রোক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১২শ ও ১৩শ শতকে ভারতেও আহলেহাদীছ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৩শ শতকে ভারতের কনৌজে সাত রাজার ধন গ্রন্থ প্রনয়ন, সংকলন ও মুদ্রণের এক মাণিক জ্বলে উঠলো, যার নাম নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান (জন্ম ১২৪৮হিঃ/১৮৩২)। তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের অকৃত্রিম আশেক্ব এবং হাদীছে নববীর একান্ত সেবক। তিনি ভারতবর্ষে হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভারতে "ছিদ্দীক্বে আকবর" নামে পরিচিত হ'লেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু দুর্লভ ও অমূল্য গ্রন্থ আনিয়ে ভারত, মিসর ও বৈরুতের বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। এর ফলে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের এমন কোন গ্রন্থাগার নেই যেখানে 'ছিদ্দীক্বে আকবারের' কমপক্ষে একখানা গ্রন্থ নেই। হাদীছের সেবায় শুধু অর্থ ব্যয় করেই ক্ষান্ত হননি বরং নিজেও কলম ধরেছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তিন শতাধিক গ্রন্থ লিখে এবং আরবী বর্ণমালার "আলিফ থেকে ইয়া" পর্যন্ত প্রত্যেক বর্ণে কমপক্ষে একটি করে গ্রন্থ রচনা করে সারা বিশ্বে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু অমূল্য রত্ন বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে হিজরী ১৩শ শতকের 'মুজাদ্দিদে উলূম' উপাধিতে ভূষিত হ'লেন।

বর্তমান শতকে আহলেহাদীছঃ ১৩শ শতকে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের এক উজ্জ্বল ভাস্কর উদিত হয়েছিল, যাঁর সম্পর্কে ভারতরত্ন মাওঃ আবুল কালাম আযাদ মন্তব্য করেছেন, "তিনি তাঁর যুগে (১৩শ ও ১৪শ শতকে) প্রায় সারা বিশ্বের শায়খুল ইসলাম ছিলেন"। এই মহামনীষী হ'লেন 'শায়খুল কুল ফিল কুল' সৈয়দ মাওঃ নাযীর হোসাইন দেহলভী মিঞা ছাহেব (মৃঃ ১৩২০হিঃ)। তিনি ১২২০ হিজরী মোতাবেক ১৮০৫ সালে এক হানাফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীছের আলো পেয়ে কোন নির্দিষ্ট ইমামের অন্ধ অনুসারী না হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হন। এই মহামনীষী বহু উত্থান-পতন ও সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ ৭৫ বছর কুরআন ও হাদীছের সুধা বিতরণ করে লক্ষাধিক ছাত্র এবং ৮০ লক্ষ লোককে আহলেহাদীছ তৈরি করেন। পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম দেশ নেই যেখানে কমপক্ষে এ মনীষীর একজন ছাত্র নেই।

সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুখারীর হাফেয আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ) এই জ্ঞান সাধকেরই ছাত্রের ছাত্র। তিউনিসিয়া বংশোদ্ভূত মুহাদ্দিছে আযম আল্লামা ইয়াহইয়াহ সানসুনী (রহঃ) ঐ মনীষীরই ছাত্র। এই দীপ্ত রবির কিরণে ভারতবর্ষের হাদীছ গগণের নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হ'লেন জামে' তিরমিযীর ভষ্যকার 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণেতা আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী, 'সুনানু আবিদাউদ'-এর ভষ্যকার 'আওনুল মা'বূদ' ও 'গায়াতুল মাকছূ'দ রচয়িতা আল্লামা শামসুল হক্ব ডিয়ানবী ও মাওঃ শারফুল হক্ব বিহারী প্রমুখ।

এই জ্ঞানের পরশ পাথরের পুণ্য পরশেই আর্য-খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী যুক্তির বিরুদ্ধে কাঁচকাটা হীরকখণ্ডে পরিণত হ'লেন আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী ও মাওঃ ইবরাহীম শিয়ালকোটী প্রমুখ। এই জ্ঞানসাগরেরই কুরআন ও হাদীছের অমৃত সুধা সিঞ্চনে বাংলার মাটিকে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করে তোলেন মরহুম আল্লামা আইনুদ্দীন, মাওঃ নে'মাতুল্লাহ, মাওঃ ইবরাহীম শেরশাহী, মাওঃ ইবরাহীম দেবকুণ্ডী, হুগলীর মাওঃ আবদুল লতীফ, ২৪পরগনার মাওঃ আবদুল বারী, রংপুরের আল্লামা আবদুল হাদী এবং আসামরত্ন সিলেটের মাওঃ মুহাম্মাদ তাহের।

এসব গুণমণিদের কুরআন-হাদীছের বীজ বপনে বাংলার শ্যামল ক্ষেতে সোনার বাংলা রূপ দিল বাংলা ভাষায় কুরআনের সর্বপ্রথম মুসলমান অনুবাদক মাওঃ আব্বাস আলী, বাংলা, আসাম ও বিহারের বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা গগণের উজ্জল নিহারিকা, আহলেহাদীছ পত্রিকার দিকপাল মাওঃ বাবর আলী, বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীরকারক ও অভিনব পদ্ধতিতে রাসূলে (ছাঃ)-এর জীবনী লেখক মাওঃ মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ, জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহিল বাকী এবং মাওঃ এফাযুদ্দীন সহ আরো অনেকে। এই সব মনীষীদেরই অক্লান্ত সাধনার ফসল হিসাবে আজও বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলাসহ সমস্ত

ভারত উপমহাদেশে কুরআন-হাদীছের একনিষ্ঠ সেবক ও নির্ভিক প্রচারক আহলেহাদীছদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, আহলেহাদীছ ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে প্রতি যুগে ছিল, আজও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না" (তিরমিযী)। ইমাম আলী বিন মাদীনী বলেছেন, "ঐ দলটি হ'ল আহলেহাদীছ।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও বলেন, "ঐ দলটি আহলেহাদীছ না হ'লে আমি জানিনা তারা কারা?" (ফতহুল বারী)। উল্লেখিত দুই মুহাদ্দিছের উক্তি অনুযায়ী বুঝা যায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যে দলটি সত্যের উপ প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা হ'ল 'আহলেহাদীছ'।

অতএব আসুন! দুনিয়াবী সকল স্বার্থ-দ্বন্দ্ব পরিহার করে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহর অহি তথা কুরআন-হাদীছের অনুসারী হই এবং নিজে একজন আহলেহাদীছ তথা খাঁটি মুসলমান হয়ে শতদলে বিভক্ত মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!

****

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

মাসায়েলে রফ'উল ইয়াদাঈন
বা
ছালাতে দুই হাত উত্তোলন

মূল ঃ মাসউদ আহমাদ
(পাকিস্থান)

অনুবাদঃ আবু জিহাদ

সম্পাদনাঃ কামাল আহমাদ

হাদিয়াঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

[গ্রন্থটি ইমাম বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাঈন ও অন্যান্য ইমামগণের প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোকে লিখিত।]

সংগ্রহ করুন সংগ্রহ করুন

পরিবেশনায় ঃ
কোরান মঞ্জিল,কলারোয়া, সাতক্ষীরা

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
দারুল মা'আরিফ
১৮৮/১,এইচ,এম,এম, রোড, যশোর-৭৪০০
ফোনঃ ৫৮৯৮(অনু)

অপসংস্কৃতি ও যুবসমাজ

-মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উম্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তার ভাষা আছে। ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা। সে নিজেকে জানাতে চায় ও অপরকে জানতে চায়। এ জানার আগ্রহ তাকে জ্ঞানের পথে বিচরণ করার প্রেরণা দিয়েছে। এ প্রেরণা থেকে যা ভাল, যা কল্যাণকর তা বরণ করে নিয়েছে। সংস্কৃতি এমনি একটি বরণ করা জীবন চেতনা। সংস্কৃতির মূল কথা - নিজেকে সুন্দর করা, সভ্য করা। সংস্কৃতি মানুষের আত্মার এমন আনন্দের দাত্রী, প্রেম ও সৌন্দর্য সংস্কৃতির মূল আশ্রয়। এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে আধুনিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি পর্দায় ভেসে ওঠে পশ্চিমা নগ্ন ও মারদাঙ্গা সংস্কৃতি। আমাদের দেশের লোকেরা তা ক্ষুধার্তের মত গিলতে শুরু করেছে। ফলে ধর্ষণ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সহ নানাবিধ সমাজ বিরোধী কর্ম আজ নিত্য দিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দুর্নিবার আগ্রাসন, অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির বিজাতীয়করণ আজ আমাদের যুব সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এমতাবস্থায় যুবকদের কাছে জাতির আবেদন-

"চিরযুবা, তুই যে চিরজীবি
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি"।

সংস্কৃতি কাকে বলেঃ সস্কৃতির সংজ্ঞা বহুভাবে দেওয়া যেতে পারে। একটা জাতির দীর্ঘদিনের জীবনাচরণের ভিতর দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরের পথে কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে, তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি স্থবির নয়, এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। তাই সংস্কৃতিকে কোন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা কঠিন। সংস্কৃতির নিজস্ব স্বক্রীয়তা আছে। দেশ-কাল-জাতি ভেদে এর রূপ ভেদ আছে কিন্তু গুণ ভেদ নেই। সংস্কৃতির মূল কথা হল সুন্দরভাবে বাঁচা। প্রেম মানবিক গুণাবলী বিকশিত করে সুন্দরভাবে বাঁচতে প্রেরণা যোগায়। যে মানুষ হিংসা থেকে দূরে থাকে, প্রেম ও করুণার ধারক সত্য ও সুন্দরের উপাসক সেই সংস্কৃতির সেবক।

অপসংস্কৃতি কিঃ অপসংস্কৃতি হল সংস্কৃতির বিকৃত রূপ। সংস্কৃতির কাজ জীবনকে বিকশিত করা, চিত্তকে আনন্দিত করা, মানুষকে প্রেমবান করা। আর অপসংস্কৃতি মানুষের জীবনে বিকৃতি আনে, চিত্তে কলুষ ঢালে, মানুষের চেতনাকে নষ্ট করে, মূল্যবোধ ভাঙন ধরায়। যে আচার বা

আচরণে মানুষের আত্মার অবনতি হয়, তাই অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল জীবন চর্চা আর অপসংস্কৃতি হল জীবন নাশ। যা সাময়িকভাবে মুগ্ধকর, মোহনীয় অথচ স্থায়ী কোন ফল তা থেকে লাভ হয় না। তাই অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি বলতে খারাপ আচার-আচারণকে বুঝায়।

যুবসমাজের পরিচয়ঃ পৃথিবীর গড় জনশক্তির শতকরা ৩০ জনকে যুবকদের পরিচয় বহন করে। যারা যুবসমাজ ব্যতিরেকে না ন্যায় বাস্তবরূপ লাভ করে, না অন্যায় বাস্তবায়িত হয়। উদ্দীপনাময় রক্তেরই নামান্তর হচ্ছে যৌবন। নতুনত্বকে লুফে নেওয়ার নাম যুবসমাজ।

যৌবনকে অস্ত্রের নামে তুলনা করা যায়, মুজাহিদের কাজেও লাগে, ডাকাতের কাজেও লাগে। সৃষ্টিজগতের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যুবসমাজ সব ধরনের অন্যায় কাজের নেতৃত্ব দিয়েছে। পক্ষান্তরে সমস্ত গঠনমুলক কাজের নেতৃত্ব যুব সমাজই সরবারহ করেছে। ভাল মন্দ যাই হোক গ্রহণ করার ব্যাপারে বয়স্কদের চেয়ে যুবকরাই বেশী দ্রুত। এ বৈশিষ্ট প্রত্যেক যুগেই একই সরলরেখায় অবস্থান করেছে। আজকের বিশ্বে যে সমস্ত অনৈতিকতা বিস্তার লাভ করেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে যুবসমাজ তা গ্রহণ করেছে, যুবসমাজই এগুলোর অধিকতর প্রসার ঘটাচ্ছে। অনৈতিক কাজের নতুন নতুন পদ্ধতি তারাই উদ্ভাবন করছে. অতএব যৌবন কোন ভাল কাজের নামও নয় আবার মন্দ কাজের প্রতিচ্ছবিও নয়। সে যদি ভাল কাজের দিকে ঝুকে পড়ে, এবং কাজটা করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। জীবন দিয়ে হলেও তা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এ যুবসমাজই যখন খারাপ পথে পা বাড়ায়, তখন তা জাতির জন্য ভয়ংকর রূপ ধারন করে। তাদের বিপথগামিতার কারণে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার।

দেশের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যঃ ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি পরিশীলিত জীবনবোধ, এই পরিশীলিত জীবনবোধ জন্ম নেয় শিক্ষা সভ্যতার আলোকে স্নাত হয়ে। আমাদের দেশের মাটির সাথে আমাদের নাড়ীর যোগ অবিচ্ছেদ্য। আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তা যদি দেশকে ভালবাসতে না শেখায়, জীবনকে প্রেমময় না করে, মানুষের প্রতি দরদী না করে, তাহলে সে শিক্ষা অপশিক্ষা। আর এ অপশিক্ষার পথ ধরে অপসংস্কৃতি আমাদের জীবনে শিকড় গাড়ে। বর্তমানে আমরা দেশজ রীতি-নীতি দেশজ মুল্যবোধ বিসর্জন দিতে শুরু করেছি। আমাদের সমাজে যে অপসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে তা তরুণ সমাজের আচার আচারণ, পোশাক-আশাক দেখলেই বুঝা যায় তারা দেশীয় আবহাওয়ায় নিজস্ব স্বতন্ত্রতাকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশী জীবনবোধকে গ্রহণ করে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে। পাশ্চাত্যের অনুগামী হয়ে ডিসকো নাচ, গান ও অশ্লীল ছবি দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এসব নাচ, গান আর পোশাক-আশাকের সাথে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির কোন মিল নেই। ফলে দেশীয় সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা হারায়েছে।

অপসংস্কৃতির প্রভাবঃ একটি দেশের ভবিষ্যৎ হল সে দেশের যুবসমাজ। এ ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার অপকৌশল হল অপসংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে বাস্তবে প্রয়োগ করা। যুবসমাজের উপর সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির কুপ্রভাব অত্যন্ত বেশী। রেডিওতে পরিবেশন করা হচ্ছে যৌন উৎসাহ মুলক অনুষ্ঠান। সিনেমার কাহিনী নাচ, গান, পোশাক-আশাক ইত্যাদি এমনভাবে সন্নিবেশিত যে, তাতে যুবসমাজ সস্তায় ও সহজে আমোদ প্রমোদের উপকরণ খুঁজে পায়।

বিশেষ করে টিভির বিজ্ঞাপনগুলো যুবসমাজকে ভোগ ও বিলাসিতার দিকে আকৃষ্ট করে তোলে। তাছাড়া ভি,সি,আর এর মাধ্যমে অশ্লীল ছবি প্রচার করেও যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটানো হয়।

সংবাদ পত্রের ভূমিকাঃ অপসংস্কৃতি প্রচারের আর একটি মাধ্যম হল সংবার্দ পত্র। অধিকাংশ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় নগ্ন ছবি, যৌনাবেগ সম্পর্কে কথিকা ইত্যাদি প্রকাশ করে যুবক যুবতীদের অবক্ষয়ের পথ সুগম করে। তাছাড়া খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির ডালি সাজিয়ে সংবাদপত্র যে নৈবদ্য পরিবেশন করে, তাও যুবসমাজের মানসিক চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করে।

ব্যবসা ক্ষেত্রেঃ দেশের শিল্পপতিরা তাদের তাদের পণ্য সামগ্রী অধিক হারে বাজারজাত করনোর্থে পণ্য সামগ্রীতে সুন্দরী রমনীদের নগ্ন ছবি সংযুক্ত করছেন যাতে যুবক-যুবতীদের অর্থাৎ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এখানেই শেষ নয় বর্তমান বাজারে শিশুদের পোশাকেও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি সহ নগ্ন ছবি দিয়ে বস্ত্রাদি, দ্রব্যসামগ্রী বাজারজাত করে একশ্রেণী লোক পুঁজিপতি হচ্ছে। অপর দিকে গোটা যুবসমাজই বিপথগামী হচ্ছে।

সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধির পিছনে টেলিভিশন ও সিনেমার ভূমিকা ঃ দেশে খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধিতে টেলিভিশন ও সিনেমার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ সময়ে নির্মিত ছবিগুলোতে ভিলেনদের এত দাপট কেন? ভিলেন অনায়াসেই একের পর এক খুন করে যায়। ভিলেনের সন্ত্রাসী কাহিনী ও অনায়াসে চালিয়ে যায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এর ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এর জন্য যেমন দায়ী তেমনি দায়ী হাল আমলের নির্মিত ছবিগুলো। সমাজে যা ঘটছে তা প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এসব খবর

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

পড়ে একজন পাঠক যতটা না প্রভাবিত হচ্ছে তার চেয়ে বেশী প্রভাবিত হচ্ছে একজন দর্শক টেলিভিশন ও সিনেমা দেখে। কারণ পাঠক খবরটি পড়ে ঘটনাটি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করতে পারে। কিন্তু সে কল্পনা এক সময় মুছেও যায়। সিনেমার খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণের দৃশ্য দেখার পর তা মনে গেঁথে যায়। আর যারা সন্ত্রাসী মানসিকতার তারা সিনেমায় দেখা সন্ত্রাসের পদ্ধতিগুলো আয়ত্ব করে বাস্তব সমাজে প্রয়োগ করে।

অপসংস্কৃতির কবলে শিশু সমাজঃ রাবেতা আলমে ইসলামীর মুখপত্র আখবারুল আলম আল-ইসলামীতে মিসরের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিসরের ৯১ শতাংশ শিশু টেলিভিশন প্রকাশমান সব ক'টি অনুষ্ঠান দেখে থাকে। তারপর পত্রিকাটি আরো লিখে যে, "এটা ৯১ শতাংশ শিশুর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এসব শিশু সারাটা দিন টিভির অনুষ্ঠান দেখার পিছনেই ব্যয় করে থাকে"।

শুধু তাই নয়, উক্ত জরিপে ৯৩ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে যারা সেসব অনুষ্ঠানের শুধু নাম বলতে পারে, যা দু'মাসের অধিক সময়ে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ৬৬ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে, যারা সেসব ফিল্মের নামের সাথে সাথে কিছুটা বিশ্লেষণ ও স্মরণ রাখতে পারে, যা তিন সপ্তাহ টিভির পর্দায় এসেছে। আর ২৭ শতাংশ শিশু এক সপ্তাহের মধ্যকার অনুষ্ঠান পূর্ণ বিশ্লেষণের সাথে স্মরণ রাখতে পারে।

অপসংস্কৃতি দর্শনে ক্যান্সারঃ প্রখ্যাত সংবাদিক এবং খৃষ্টান মিশনারীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য 'ডাঃ এন. ভ্যাগমর' তার 'হোয়াই সাফার' নামক বইয়ে লিখেছেন টেলিভিশন এক ধরনের এক্স-রে মেশিন। ডাক্তারগণ যে এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করেন তার মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে টিভিতে এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ এক্স-রে মেশিনটির আলোটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর এ আলো যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কল্পনা করলেই তা কলিজা কেঁপে উঠে।

তিনি আরো লিখেছেন, ছেলে-মেয়েরা টিভি সেটের সামনে বসে নোংরা অনুষ্ঠান দেখে, অথচ এর থেকে মানবদেহে জন্ম নেয় ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সার। আমেরিকার বোষ্টান শহরে মাত্র একটি শহরে একটি হাসপাতালে ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারের শিকার হয়ে ছ'শত ছেলে-মেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

'ডাঃ গ্রোড বে' লিখেছেন সাদা কালো টিভি সেটে ১৯ কিলোওয়াট, রঙ্গিন টিভিতে ২৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত টিউব থাকে। প্রথম প্রথম ১৬,১৬ কিলোওয়াট বিশিষ্ট এক্স-রে মেশিন ও তার ব্যবহারকারী টেকনিশিয়ানের দেহে ক্যান্সারের জীবন জন্ম দিত। (পরে তাঁর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়।) এবার অনুমান করুন, যেখানে ১৬ কিলোওয়াটের এক্স-রে মেশিন ও সৃষ্টি করত, তাহলে যে টিভিতে ১৯ থেকে ২৬ কিলোওয়াট টিউব থাকে তা কতটুকু ক্ষতিকর।

'টিভি কা যহর' নামক পুস্তিকা থেকে আরো কিছু রোগের কথা জানা গেছে-

১। টিভি, ভি,সি,আর এ অনুষ্ঠান দেখার ফলে মস্তিস্কের শিরা ফেটে গেছে।

২। টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার ফলে দৃষ্টি শক্তিদুর্বল হয়ে গেছে।

৩। টিভি দেখায় অভ্যস্থ শিশুদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ফলে লেখাপড়া থেকে তাদের মন উঠে যায়।

প্রতিকারঃ যুব সমাজকে সুপথে ফিরায়ে আনা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়েছে। আর এ দায়িত্ব পালনের ভার সমাজের সচেতন মহলকে অবশ্য নিতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো তথা টিভি, সিনেমা ও পত্র পত্রিকাগুলোকে গঠনমুলক হতে হবে। চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সুনিদিষ্ঠ ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত উলাঙ্গময় অপসংস্কৃতি বন্ধের জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। যুবসমাজকে অহি অনুসরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যুবসমাজকে তাদের যৌবনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে তুলতে হবে। কেনান মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবজীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে জনাবে রাসুল (ছাঃ) এরশাদ করেন- তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বেই তুমি তোমার যুবজীবনের মুল্যায়ন কর। হাদীছের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هدمك وغناك قبل فقرك

অতএব আমাদের বার্ধক্য আমার পূর্বেই যুবজীবনের মুল্যায়নে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আত্মার পরিশুদ্ধি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সঠিক জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা জীবনের সার্বিক পূর্ণতা। এ সকল গুণাবলীর আধিকারী একজন যুবক আল্লাহর প্রদত্ত আমানত রক্ষা ও তার জীবনে জবাবদিহীর সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হতে পারে। কখনও কোন দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। যে কোন প্রকারের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন তাকে গ্রাস করতে পারে না। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন বলেনঃ- ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر "নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে দুরে রাখে(আনকাবুত ৪৫)।" সুতরাং যুবসমাজকে ছালাতে ব্রতী হতে হবে। যুবকদের ছালাত প্রসঙ্গে রাসুল (ছাঃ) বলেনঃ- سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشأ فى عبادة الله.....

কিয়ামতের ময়দানে বিভিষিকাময় মুহূর্তে একমাত্র এই গুণবিশিষ্ঠ যুবকরাই আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে। অতএব যুবসমাজকে অহি শিক্ষায় অনুপ্রানিত করতে হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে কবি নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতা-

"ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল"।

সমাপনীঃ যুবসমাজই হচ্ছে জাতির আশা আকাংখার প্রতীক। সে সমাজই যদি মিথ্যা আগ্রহে তাদের চেতনা বিকশিত করে তাহলে অপসংস্কৃতি তাদের কাছে আদরনীয় হবে। আর অপসংস্কৃতি আদরনীয় হওয়া অর্থ সমস্ত জাতির জন্যে মারাত্মক বিপদ। তাই দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের রক্ষা করতে হবে। তাদের তারুণ্যকে সৎ ও সঠিক পথে পরিচালিত করার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শিরক বিদআত বিবর্জিত অহি ভিত্তিক সুষ্ঠ সংস্কৃতি চর্চার অভ্যাস। তাহলেই অহি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মান করা সম্ভব হবে। তাদের কাছে আমাদের আহ্বান হচ্ছে-

"ওরে তরুণ, ওরে আমার কাঁচা
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"।

সত্যের ডাক

রুবেল প্রধান, আড়াই হাজার,নারায়নগঞ্জ।

আজকে তুমি ছোট আছ
কালকে হবে বড়,
ভালো হবার জন্য তুমি
সত্য পথ ধর।
সত্য পথে চলব মোরা
সত্য কথা বলব,
এমনি ভাবে সারা বিশ্বে
সত্যের ঝড় তুলব।
রাসূল মোদের বলে গেছেন
সত্য পথে চলতে,
সত্য কথা বলতে।
মিথ্যা কথা বললে
হবে জাহান্নামী।
দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে
সেথায় চিরস্থায়ী।
এসো ভাই কর্মীর দল
সত্য কথা বলি,
সত্য কথা বললে মোদের
দুঃখ যাবে চলি।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

-মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (কুমিল্লা)

জিহাদ' শব্দটি আরবী 'জুহদুন' শব্দ হ'তে উৎকলিত। এর শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা, সাধনা করা। শরীয়তের পরিভাষায়- (১) আল্লাহর পথে নিজের সর্বপ্রকার সামর্থ্য নিয়োগ করাকে 'জিহাদ' বলে। (২) আল্লাহর খালিছ তাওহীদ ও তাঁর অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে 'জিহাদ' বলে। (৩) সমাজে সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে 'জিহাদ' বলে। (৪) সমাজ হ'তে সর্বপ্রকার বাতিল শক্তি এবং কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ বিরোধী প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে মানুষের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ ব্যয় করার নাম 'জিহাদ'। যিনি উক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চেষ্টিত হন তিনিই 'মুজাহিদ'।

জিহাদ কেন? মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তারা শুধু তা'রই প্রেরিত অহি ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বীয় জীবন যাপন করবে। কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাগুতী শক্তির পদভারে সমাজজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন আজ বিপন্ন। মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, ঝগড়া-বিবাদ, যেনা-ব্যভিচার, হত্যা, গুম, ছিনতাই, অপহরণ, প্রতারণা এসবই জাহেলী যুগকে হার মানিয়েছে। জাতির এ দুর্দিনে আমাদের কি কিছু করার নেই? অথচ বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ঘোষণাঃ "তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করনা? অথচ দুর্বল, অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, হে আমাদের প্রভু! যালিমদের এ জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে নিন এবং আমাদের জন্য (গায়েব) হ'তে কোন অভিভবক মনোনীত করে দিন এবং কোন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন" (নিসা ৭৫)।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছ যে, এ মনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের প্রভু জানবেন না যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কারা ধৈর্যশীল" (আলে ইমরান ১৪২)। আয়াতদ্বয়ের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতের প্রত্যাশী মুমিন বান্দাগণের জন্য সমাজের মারাত্মক ব্যধিসমূহ নির্মূলের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত ঘোষণা শুনুন ঃ "তোমদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হ'ল যদিও তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় মনে হচ্ছে; হ'তে পারে কোন বিষয় তোমাদের নিকট অপসন্দীয়, অথচ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এমনও হ'তে পারে যে, কোন বিষয় তোমাদের পসন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। সঠিক সমাধান তো আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না" (বাক্বারাহ ২১৬)।

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও জিহাদ করেছে তারাই আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ অত্যধিক ক্ষমাশীল ও করুণাময়" (বাক্বারাহ ২১৮)।

"যে ব্যক্তি জিহাদ করবে সে স্বীয় কল্যাণের জন্যই জিহাদ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন" (আনকাবুত ৬)।

"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে বিষয়ে সীমালংঘন করনা, কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না" (বাক্বারাহ ১৯০)।

"আর আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর এবং খুব ভালরূপে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"(বাক্বারাহ ২৪৪)।

"আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা কর্তব্য সে সব লোকদেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয় এবং যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে নিহত হবে অথবা বিজয়ী হবে তাকে আমরা অবশ্যই মহান প্রতিদান দেব"(নিসা ৭৪)।

"ঈমানদারগণ সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর" (নিসা ৭৬)।

"তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম কর যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়" (আনফাল ৩৯)।

"তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না কর তাহ'লে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা" (তাওবা ৩৯)।

"তোমরা বেরিয়ে পড় হালকাভাবে এবং ভারী হয়ে আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন বিনিময়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ" (তাওবা ৪১)।

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিক্ব উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরনীতি অবলম্বন করুন। তারা তো জাহান্নামী। জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান" (তাওবা ৭৩, তাহরীম ৯)।

"হে ঈমানদারগণ! সংগ্রাম কর সত্য অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করতে পারে" (তাওবা ১২৩)।

"আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে বাছাই করেছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেন নাই"(হজ্জ ৭৮)।

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দেব না, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব হ'তে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ কর নিজেদের ধন- সম্পদ ও জীবনের বিনিময়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জান"(ছফ ১০-১১)। সম্পদের প্রতি অধিক লোভী না হয়ে বরং সম্পদ ও জীবন জিহাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কঠিন আযাব হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার পূর্বে শর্তারোপ করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! সমাজের প্রতিটি স্তরে যেভাবে আল্লাহ্র নাফরমানী বিরাজিত তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র অবলম্বনই হচ্ছে জিহাদ। হে প্রিয় যুবক ভাই! রাসূল (ছাঃ) বলেন,"জেনে রেখো! জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে" (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫)।

জিহাদের ব্যাপারে শিথিলতা বা অলসতার পরিণামঃ পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর জিহাদ ফরয করেছেন-এ বিষয়ে প্রায় ৬০০(ছয়শত) আয়াত নাযিল করেছেন। যার কতিপয় অত্র প্রবন্ধে স্থান পাবে। "যদি তোমরা জিহাদের জন্য বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমদের কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন অপর এক জাতিকে যাদের তোমরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না"(তাওবা ৩৯)। অতঃপর জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলেন- "তারা মুমিনদের প্রতি হবে নম্র ও বিনয়ী এবং কাফেরদের প্রতি হবে অধিক কঠোর"(মায়েদা ৫৪)।

আধুনিক জাহেলী বিশ্বে জিহাদ বিমুখতা সমাজ দেহকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। অথচ আল্লাহ্র নির্দেশঃ "তোমাদের উপর জিহাদ ফরয় করা হ'ল"(বাক্বারাহ ২১৬)। প্রশ্ন হ'তে পারে, এ জিহাদ কত দিন স্থায়ী হবে? অথবা এখন কি আর জিহাদ করার প্রয়োজন আছে? এর সমাধানে আল্লাহ্ বলেন-"তোমরা যুদ্ধ কর যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল হয়"(আনফাল ৩৯)। আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হ'ল যে, পৃথিবীতে যতদিন অন্যায়, দুর্নীতি, কলহ, বিশৃংখলা থাকবে ততদিনই মুসলমানদের উপর জিহাদ করা ফরযে আয়েন।

যুদ্ধ কাদের সাথেঃ এখন প্রশ্ন হবে মুসলমানগণ কার সঙ্গে জিহাদ করবে? এ বিষয়ে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলেন, "তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে" (নিসা ৭৬)। প্রতীয়মান হ'ল যে, মানুষ যখনই আল্লাহ্র দাসত্ব বর্জন করে শয়তানের প্রদর্শিত পথে পা বাড়ায়, তখনই তার বিরুদ্ধে জিহাদে সোচ্চার হ'তে হবে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর"। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট।

জিহাদের পথে বাধাঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুমেয় যে, আমরা জিহাদের প্রতি সে পরিমাণ গুরুত্ব দেই না, যে পরিমাণ গুরুত্ব স্বীয় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ রক্ষায় দিয়ে থাকি, আর সে বিষয়কে কেন্দ্র করেই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, মাতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর। তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পসন্দ কর । উপরোক্ত

বিষয়গুলো যদি (ক) আল্লাহ্ (খ) তাঁর রাসূল ও (গ) তাঁর রাহে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। (এরূপ হ'লে) তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ্র আযাব আসা পর্যন্ত''(তাওবাহ ২৪)। বুঝা গেল যে, উপরোক্ত ৯টি বিষয় গৌণ এবং ১০ম বিষয়টি মুখ্য।

উপরোক্ত বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করলে কোন মুসলমান জিহাদ বিমুখ হ'তে পারেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,''যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এ অবস্থায় যে, সে যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধের আকাংখাও পোষণ করেনি, সে যেন মুনাফিক্ব অবস্থায় মারা গেল'' (মুসলিম)। হাদীছদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, সর্বাবস্থায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাবুকের যুদ্ধে কা'ব বিন মালিক যুদ্ধ বর্জন করায় মহানবী(ছাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে তাকে বয়কট করেন ও ছাহাবায়ে কিরাম তার সাথে ৭০ দিন কথা বলেন নাই। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন।

ব্যতিক্রমধর্মী ধারণাঃ মহানবী (ছাঃ)-এর যামানায় যখনই ছাহাবীদেরকে বলা হ'ত জিহাদে চল। তখনই তাঁরা তরবারী ও ঘোড়া নিয়ে আল্লাহর পথে শাহাদত লাভের দুর্নিবার আকাংখায় কাফিরদের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রিয় নবীর জীবদ্দশায় জিহাদের এ পরিভাষাটিই প্রযোজ্য ছিল। সে কারণেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে এক বিশেষ ইবাদতকে বুঝানো হ'ত। ফলে এ জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর কোন সদস্য যদি জীবিত থাকে, তবে তাঁকে গাযী বলা হয়। আর মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে শহীদ বলা হয়।

পক্ষান্তরে আজকের বিশ্বে জিহাদ শব্দটি প্রচলিত সন্ত্রাস অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যাদের ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান আছে, তাদের এ ধারণা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। সর্বযুগে বরিত ইসলামী আইনজ্ঞ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'নিজের সবটুকু শক্তি কাফিরের মোকবিলায় ব্যয় করাকে জিহাদ বলে' (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২)।

প্রচলিত অর্থে জিহাদ শব্দের অর্থ করা হয় ধর্মযুদ্ধ। এতে করে শব্দটি সঠিক অর্থে প্রয়োগ না হয়ে একটা বিকৃত অর্থ উপস্থাপন করে। তখন জিহাদের অর্থ দাঁড়াবে একদল ধর্মান্ধ ব্যক্তি হাতে খোলা তরবারী, বন্দুক, মেশিনগান, গোলা-বারুদ নিয়ে যুদ্ধের হুংকার দিয়ে অসহায় মানুষদেরকে ও অমুসলিমদেরকে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে। জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত এ ধারণা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র।

মুজাহিদের মর্যাদাঃ পূর্বেই উক্ত হয়েছে, যিনি জিহাদ করেন, তিনিই মুজাহিদ। আর এ মুজাহিদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর বাণীঃ 'মহান আল্লাহ মুজাহিদগণকে উপবিষ্টদের (যারা জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকেন) উপর এক মহান প্রতিদানে ধন্য করেছেন।' সকল প্রকার জিহাদী কাজে অবহেলা, সহযোগিতা না করা, উৎসাহিত করা হ'তে বিরত থাকাই যুদ্ধের সময় ঘরে অবস্থান করার শামিল।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সময়, শ্রম ও জীবনের মূল্য কতবেশী তা নিম্নোক্ত হাদীছ হ'তে সহজেই বুঝা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর পথে দ'খানা পায়ের জন্য জাহান্নাম হারাম'। অন্যবর্ণনায় এসেছে যে, 'আল্লাহর রাস্তায় ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখেনো একত্রিত হবে না' (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২)।

প্রিয়নবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তির দু'পা আল্লাহ্র পথে ধূসরিত হয়েছে তা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা' (বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫)। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কেননা একজন মুজাহিদ ও জান্নাতের মধ্যে ব্যবধান হ'ল মৃত্যুবরণ করা।

জিহাদ বিমুখতাঃ প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! একবার ভেবে দেখুন! আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কোন ইসলাম রেখে যাচ্ছি। আজ মুসলমানদের সামনে জিহাদের কথা বললেই একটা বড় ধরনের সংঘাত, সন্ত্রাস, হানাহানি, মুসলিম নিধন, হত্যাযজ্ঞ এসব বুঝে থাকি; আসলে কি তাই? যদি তা না হয়, তবে আসুন! অন্যায় সমূলে উৎখাত করার জন্য চেষ্টিত হই।

জিহাদের হাতিয়ারঃ

প্রথমতঃ জিহাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল 'কথা'। যে কারণে আমি জিহাদে লিপ্ত হ'ব, সে কারণটি খুঁজে বের করতে হবে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রথমতঃ তাকে অন্যায়ের কুফল ও আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করে তুলতে হবে। এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন- 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের সম্পদ, জীবন ও যবান দিয়ে' (আবুদাউদ, নাসাঈ)। প্রাথমিক এ চিকিৎসায় ভাল ফল না হ'লে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ মোতাবেক সশস্ত্র জিহাদ করতে হবে। তবে তা আত্মঘাতী যেন না হয়।

দ্বিতীয়তঃ লেখনীর মাধ্যমেও জিহাদ করা যায়। যেমনটি করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)। তিনি রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাটকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। যেখানে যে পদ্ধতি সর্বাধিক কার্যকর সেখানে সেভাবেই জিহাদের হাতিয়ার নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। জনমত সৃষ্টির মাধ্যমের সমাজবিপ্লব ঘাটানো। এভাবে সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় মানুষদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনতে পারলেই এটা সম্ভব। আর রাষ্ট্র হ'ল সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই অনৈতিকতার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক।

যদি উপরোক্ত তিনটি হাতিয়ারই অকেজো হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে, সমাজে ন্যায়নীতি পরাজিত হয়, সত্য নিশান মুখ থুবড়ে পড়ে, অন্যায়-

অনাচার, অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, বেহায়াপনা লাগামহীনভাবে চলতে থাকে এবং রাষ্ট্রশক্তি যদি ব্যর্থ হয়, তবে তা প্রতিরোধ কল্পে সশস্ত্র জিহাদের বিকল্প নেই। কিন্তু অন্যায় প্রতিরোধের অজুহাতে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের পক্ষ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদের নামে সশস্ত্র জঙ্গী তৎপরতা চালানো ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। অতএব নিরন্তর দা'ওয়াত ও তেজোদীপ্ত সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক পরিবর্তন ও কল্যাণ সাধন এবং আল্লার সন্তুষ্টিই হবে এদেশে জিহাদের পথ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে আসুন সকলে মিলে একই শ্লোগান স্থির করি, 'মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ'। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত মুজাহিদ হওয়ার তাওফীক্ব দাও। আমীন!!

সে তো ভালো নয়

-নূরুল ইসলাম
মুর্তুযাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ।

যেই ছেলেটি জেনে শুনে
মিথ্যা কথা কয়
সে তো ভালো নয়।
কাজের সময় কাজ করে না
পড়ার সময় বই পড়ে না।
দুষ্টমিটা করে শুধু
ঘুরে পাড়াময়
সে তো ভালো নয়।
গুরুজন ঠিক মানে না
মন্দ-ভালর ধার ধারে না।
দুষ্ট কাজে খুবই পটু
ভালো কাজে ভয়
সে তো ভালো নয়।

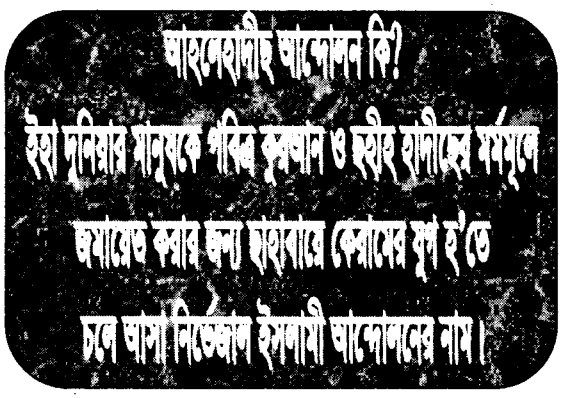

শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন

-ক্বামারুয্যামান (জামালপুর)

শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন! নামটি থেকেই দক্ষিণা সমীরণের ন্যায় নাসারন্ধ্রে হু হু করে ভেসে আসে শিরকিয়াতের দুর্গন্ধ। কারণ এই নশ্বর বিশ্বে চিরন্তন বলতে কোন কিছু নেই। একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই চিরন্তন। একমাত্র তিনিই হাইয়্যুন, তিনিই কাইয়্যুম। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام- সব কিছু ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালন কর্তার সত্তা চিরন্তন'(আর-রহমান ২৬ ও ২৭)। সুতরাং দ্বিতীয় কোন কিছুকে চিরন্তন নামকরণ ও বিশ্বাস করা শিরক ছাড়া অন্য কি হ'তে পারে?

শিখা চিরন্তন স্থাপনের প্রেক্ষাপটঃ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণটিকে জাতির মাঝে চির অম্লান রাখার লক্ষ্যে স্মৃতিস্বরূপ ১৯৯৭ সালের ৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মহা ধুমধামের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে এই 'শিখা অনির্বাণ' প্রজ্বলিত করেন এবং বলেন,'এই শিখা চিরন্তন চিরদিন প্রজ্বলিত থেকে আমাদের গৌরবের ইতিহাসকে ধারণ করবে'। তারপর প্রায় প্রতিটি যেলাতে শিখা চিরন্তন প্রদর্শন ও সম্মান গ্রহণ পূর্বক ২৬শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপন করেন।

শিখা চিরন্তন সত্যিই কি চিরন্তনঃ এই নশ্বর বিশ্বে কোন কিছুই চিরন্তন হ'তে পারেনা। সুতরাং শিখার মত পরনির্ভরশীল (যাকে জ্বালালে জ্বলে, জ্বালানী বন্ধ করলে বন্ধ হয়ে যায়) পদার্থ কিভাবে চিরন্তন হ'তে পারে? আর একে চিরন্তন নামকরণ করলেই তা কিভাবে সত্য প্রমাণিত হ'তে পারে? কুরআন-হাদীছ ও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুগে যুগে যারাই আল্লাহর একত্ববাদের মধ্যে শিরকের বীজ বপন করতে চেষ্টা করেছে, তাদের অধিকাংশই ধ্বংস বা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। যেমন ফেরাউন বলেছিল- انا ربكم الأعلى 'আমি তোমাদের বড় প্রভু'। আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের প্রভুত্বের বাসনাকে সাগরের বুকে সমাধিস্থ করেন। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে- واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا أل فرعون وانتم تنظرون "আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বি-খণ্ডিত করলাম, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়েছিলাম এবং ডুবিয়েছিলাম ফেরাউনের দলকে এবং তোমরা তা দেখছিলে"।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সাদ্দাদ নিজেই বেহেশ্ত নির্মাণ করেছিল কিন্তু তাকে সহ তার সাধের বেহেশ্তকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে বাদশা নমরুদও প্রভুত্বের দাবী করেছিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষুদ্র একটি মশা দ্বারা তার প্রভুত্বের সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন। রাব্বুল 'আলামীনের কি শান! আমরা অনুরূপভাবে লক্ষ্য করলাম চিরন্তন নামকরণের শিখাটি চার মাসও চিরন্তন হ'তে পারলনা। নামকরণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। যতদূর মনে পড়ে দিনটি ১৯৯৭ সালের ১২ই জুন হবে, আমি তখন ঢাকা মহাখালী দারুল উলূম হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসার ছাত্র। আমার জনৈক বন্ধু দৈনিক ইনকিলাব হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হোষ্টেল রুমে প্রবেশ করে বলল- দেখ দোস্ত! শিখা চিরন্তন নশ্বর হয়ে গেছে। খুবই মনোযোগের সাথে কলামটা পড়লাম, তাতে লিখেছে 'গত রাত ১১টার দিকে শিখা চিরন্তনের পর্যাপ্ত জ্বালানী দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও নৈশ প্রহরীদের সামনেই হঠাৎ করে নিভে গেছে শিখা চিরন্তন'। আমরা কয়েক বন্ধু কৌতূহলী হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গেলাম ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখার জন্য। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম শিখা আবারও প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য চারদিকে কড়া পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে।

অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বুঝা যায় যে শিখা চিরন্তন, চিরন্তনই বৈকি। কেননা যারা অগ্নিকে কোন কিছুর প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে, অগ্নিকে পুষ্পমাল্য দেয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করে, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে বা সেলট দেয় বা অন্য কোন উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করে এবং অপরকে এতে উৎসাহিত করে, তারা নিঃসন্দেহে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মুশরিকেরা নিজেরা অগ্নিকে সম্মান/ উপাসনা করে এবং অপরকে এতে উৎসাহিত করে। আল-কুরআনে রাব্বুল আলামীন মুশরিকদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন-أولئك يدعون الى النار "তারা (মুশরিকগণ মানুষকে) অগ্নির (জাহান্নাম) দিকে আহ্বান করে" (মায়েদা ৭২)।

আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মুশরিকগণ কখনও বেহেশ্তে যেতে পারবেনা এবং অগ্নিই (জাহান্নাম) হবে তাদের চিরসাথী। কুরআন এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে-

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين من النصير– "নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম (অগ্নি) এবং এরূপ যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই"। যেহেতু মুশরিকদের নিকট অগ্নি দুনিয়ার জীবনেও ভালবাসার বা সম্মানের বস্তু এবং আখিরাতেও তাদের চিরসাথী। সুতরাং তাদের নিকট "শিখা" (অগ্নি) চিরন্তন বটে।

শিখা চিরন্তন কি মুসলিম সংস্কৃতিঃ শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলিত করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, শহীদ মিনার দেশের মহান ব্যক্তিদের ও জাতীয় বীরদের মূর্তি গড়ে সেখানে ফুলের তোড়া দিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, এপ্রিল ফুল পালন করা মুসলিম সংস্কৃতি নয়। এগুলো হ'ল বৈজ্ঞানিক যুগের নব্য শিরক, মূর্তিপূজা ও কবর পূজার আধুনিকীকরণ।

বিশ্বের সমস্ত ওলামায়ে দ্বীন এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন যে, অন্য কোন ধর্মের পূজনীয় কোন বস্তুকে সম্মান করা শিরক, এতে ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাক বা না থাক। বর্তমান সরকারের গৃহপালিত কিছু সংখ্যক আলেম নামের নরকের কীট ফৎওয়া দিচ্ছে যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য না থাকলে শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ, স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য ইত্যাদি স্থাপনে কোন পাপ হবে না। ফৎওয়াটি ইসলামী শরী'য়তের অনুকূলে না প্রতিকূলে তা নিম্নের হাদীছ হ'তে বুঝা যাবে।

عن انس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان– "হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন,আযানের জন্য ছাহাবীগণ অগ্নি প্রজ্বলন ও শিঙ্গার উল্লেখ করলেন। একে কেউ কেউ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রথার কথা বলে প্রস্তাবটি নাকচ করলেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) কে আযানের জন্য নির্দেশ দেয়া হ'ল"।

অগ্নি প্রজ্বলন ও শিঙ্গায় ফুঁক দিয়ে মানুষকে ছালাতের কথা স্মরণ করে দেয়ার মধ্যে ইবাদতের বা সম্মান প্রদর্শনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তদুপরি অগ্নি ইহুদী ও মাজূসীদের ধর্মীয় প্রথা এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রথা। বিধায় প্রস্তাবটি নাকচ করা হয়েছে। তা হ'লে শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণ কিভাবে ইসলামী শরীয়তে বৈধ হ'তে পারে? কেননা শিখা চিরন্তনের সাথে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি বিজড়িত। এর সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়, ফুলের তোড়া দেয়া হয়, শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এমনকি সেলুটও দেয়া হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি।

শিখা চিরন্তন কাদের সংস্কৃতিঃ শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণ হিন্দু ও পারসিক সংস্কৃতি। প্রাচীন কালে পারস্যের অধিবাসীগণ অগ্নিদেবতার পূজা করত। হিন্দু ধর্মে অগ্নি ছোট দেবতা নয় বরং অন্যতম প্রধান দেবতা। অগ্নি দেবতার তিনটি রূপ যথা- আকাশে সূর্য, বায়ুমণ্ডলে বজ্র ও পৃথিবীতে অগ্নি শিখা। হিন্দুগণ গোসল শেষে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করে সূর্যকে প্রণাম করে। হিন্দুগণ ভোরে শয্যা ত্যাগের পর প্রত্যহ বিভিন্ন দেবতার সাথে অগ্নি দেবতা উল্লেখ পূর্বক "প্রাত শ্লোক" পাঠ করে-

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নত্য দুগাক্ষরদ্বয়ম,
আপাদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা।

ব্রহ্মা, মুরারী, ত্রিপুরান্তকারী, ভানু, শশী,
ভূমি, সূত, বুধশ্চ, গুরুশ্চ, শুক্র, শনি, রাহু,
কেতু কুর্বন্তি সর্বেমম সুপ্রভাত।
অহল্যা দ্রুপদী কুন্তি তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চ-কন্য স্মরেন্নিত্য; মহাপাতক নাশনম।

অর্থঃ "সূর্যোদয়ের সাথে যেমন ভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়, ঠিক তেমনই যে ব্যক্তি প্রভাতকালে 'দূর্গা' এ দু'টি অক্ষর স্মরণ করে, তার সকল বিপদাপদ নাশ হয়ে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য, চন্দ্র, ভূমি, সূর্ত, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু এরা সকলে আমার প্রভাতকে সুপ্রভাতে পরিণত করুক।"

হিন্দুগণ ধনসম্পদ লাভ, ক্ষুধা নিবারণ, বিপদ ও শত্রু হ'তে রক্ষা পাবার জন্য অগ্নি দেবতার উপাসনা করে। যেমন-

ন্যগ্নিং জ্ঞাতবেদসং দধাতা দেব মুত্তিজম্
প্রযজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ।
চিকিত্বিন্মনসং ত্বা দেবং মর্তাস উৎয়ে।
বরেণ্যস্য তেহুবস ইয়ানা সো অন্মহি॥

অর্থঃ 'হে মজমানগণ! তোমরা জাত বেদা দীপ্তিশীল যাগ নির্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর, অদ্য যেন দেবগণের অভিলষিত, যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাদের নিকট উপস্থিত হয়। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তোমার হৃদয় জ্ঞান সম্পন্ন, তুমি রক্ষা করবে বলে লোকে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি বরণীয়, আমরা রক্ষাণার্থে তোমার স্তব করছি।

অগ্নি দেবতা সম্পর্কে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় গ্রন্থ বেদে বলা হয়েছে-

ওঁ কারস্য ব্রহ্মাণ্ড ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোগ্নি দেবতা
সর্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

অর্থঃ "ওঁকার মন্ত্রের ঋষি ব্রক্ষা, ছন্দ-গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি সকল কার্যের প্রথমে প্রয়োগ হয়।"

অগ্নি দেবতা সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, বেদ, ভাগবত পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিতে এমন ব্যাপক আলোচনা রয়েছে যে, তা আলোচনা করলে প্রবন্ধের আয়তন ব্যাপক বৃদ্ধি হবে বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম।

প্রোক্ত আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণ মুসলিম সংস্কৃতি নয় বরং হিন্দু সংস্কৃতি।

যুক্তির কষ্টি পাথরে শিখা চিরন্তনঃ মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম ও মহান স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে শিখা চিরন্তন। কিন্তু এটি মুক্তিযুদ্ধ দেশপ্রেম ও মহান স্বধীনতার প্রতীক হিসাবে স্থাপন করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ কথা সকলের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, অগ্নির প্রধান বৈশিষ্ট হ'ল কোন কিছুকে পুড়য়ে নিঃশেষত, নাশচহ্ন বা ধ্বংস করা। তাহ'লে সেই ধ্বংসকারী অগ্নি মহান স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হ'তে পারে? বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পারছি 'শিখা' তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের (পুজি নিঃশেষিত করা, নিশ্চিহ্ন করা ও ধ্বংস করার) দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

অনেক ত্যাগ ও বুকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা দিন দিন বিপন্ন হ'তে চলছে। পানি চুক্তি ও পার্বত্য চুক্তির পর প্রক্রিয়ারত করিডোর চুক্তি, সীমান্তে বি.এস.এফ-এর নিয়মিত হামলা, ফারাক্কা ও গোজলডোবা ব্যারেজ ও অন্যান্য বাঁধ সমূহের মাধ্যমে উজানে পানি শাসন, খরা ও বন্যার সৃষ্টি, অসম বাণিজ্য, প্রায় উন্মুক্ত চোরাচালানী, অস্ত্র ও মাদক সরবরাহ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, মুদ্রাপাচার, আদমপাচার, মেধাপাচার, দক্ষিণ তালপট্টি দখল, বেরুবাড়ী দখল, দহগ্রাম-অঙ্গরপোতা সহ ছিটমহল সমস্যা, মহুরীর চর দখল প্রক্রিয়া, রাজশাহী শহরে পশ্চিম বঙ্গ ও আসাম পুলিশের কথিত দুঃসাহসিক গোপন অভিযান। সীমান্তে বি.এস.এফ কর্তৃক নির্বিঘ্নে গুলি চালিয়ে বাংলাদেশী হত্যা, বিভিন্ন সীমান্তে ভারতীয় মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে পুশইন করার অপচেষ্টা, সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় বিমান হামলা, সীমান্তে মূল্যবান পিলার চুরি করে সীমান্ত নিশ্চিহ্নকরণ, সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন, বাংকার খনন, অত্যাধুনিক ভারী অস্ত্র-শস্ত্র মোতায়েন বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আজ তাদের বা তাদের উত্তরসূরীদের হাতে স্বাধীনতা ভূ-লুন্ঠিত প্রায়। এ যেন পিতা কর্তৃক পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার নামান্তর।

ধিক, শত ধিক, ঐ সমস্ত নেতা-নেত্রীদের প্রতি যাদের হাতে স্বাধীনতা বিপন্ন হ'তে চলছে। মনীষীগণ ঠিকই বলেছেন- "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"।

শেষকথাঃ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। মুসলিম সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও শিরকিয়াতের অন্যতম হাতিয়ার শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণকে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে স্থাপন করে মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টাকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন-من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোন গর্হিত বা অনৈসলামিক

কাজ হ'তে দেখে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। অতঃপর যদি এতে সে অসামর্থ হয় তবে, সে যেন কথা দ্বারা তা প্রতিহত করে এবং এতেও যদি অসামর্থ হয়, তবে সে যেন মনে মনে কৌশল অবলম্বন করে তা প্রতিহত করে। এটাই সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" প্রশ্ন হ'তে পারে যে, মঙ্গল প্রদীপ, ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার এবং সরকারের অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যাবলী প্রতিহত করা কিভাবে সম্ভব? তার উত্তরে বলা যায়, যেহেতু আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সরকার নির্বাচন করতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পাড়াগাঁয়ের অজমূর্খ আধা পাগলের মূল্য সমান। সুতরাং সাধারণ জনগণের পক্ষে সরকারের অনৈসলামিক কার্যাবলী প্রতিহত করার ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার মোক্ষম হাতিয়ার হ'ল এ ধরনের যালিম সরকারকে ভোট দান থেকে বিরত থাকা। আর তাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে তারা যে সমস্ত ইসলাম পরিপন্থী আইন পাশ করবে তার সম অপরাধী প্রত্যেক ভোট দাতাকে হ'তে হবে। তাই আসুন! আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকা তলে একতাবদ্ধ হয়ে যাবতীয় ইসলাম পরিপন্থী কার্যাবলী প্রতিহত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। আল্লাহুম্মা আমীন!!

✡✡✡✡✡✡✡

আহবান

-মিনারুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা, রাজশাহী।

জাগো মুসলিম জাগো মুজাহিদ
জাগো হে মমিন ভাই,
যান-মাল ব্যয়ে চল এগিয়ে
চল জিহাদে যাই।
আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে
নেই তো মোদের ভয়
আল্লাহই মোদের সহায় আছেন
মোদের হবেই জয়
অহির বিধান কায়েম করতে
সব মানুষকে ডাকবো
বাতিলের বিরুদ্ধে মোরা সবে
এক সাথে লড়বো।
সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে
নতুন বিশ্ব আনবো
শির্ক-বিদআত মুক্ত করে
ভুবনটাকে গড়বো।

✡✡✡✡✡✡✡

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

**নূরুল ইসলাম, নওদাপাড়া মাদরাসা।*

শিক্ষা মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের সুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। ফলে মানুষ ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম হয় এবং পাপের কাজ পরিহার করে চলে। অপরপক্ষে অশিক্ষা বা অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুপ্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। ফলে সে মানুষ হয়েও মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সে সততই পাপের পথে ধাবমান হয়। এ জন্য দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন-"From knowledge come virtue and goodness; from ignorance comes all that is evil. No man willingly chooses what is evil; he does evil out of ignorance." অর্থাৎ "জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পুণ্য এবং কল্যাণ; অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোন লোকই স্বেচ্ছায় যা কিছু খারাপ তা পছন্দ করে না; সে পাপ করে অজ্ঞতার কারণে।"

আমরা মুসলিম। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়া উচিত ইসলামী। কারণ ইসলামী শিক্ষাই বর্বর মানুষকে সোনার মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে।

ইসলামী শিক্ষা কিঃ শব্দের ব্যুৎপত্তিবিজ্ঞান অনুযায়ী Education শব্দটি ল্যাটিন 'Edex`এবং 'Ducer-Dur` শব্দগুলো থেকে এসেছে। শাব্দিকভাবে এটি দাঁড়ায় Pack the information in and draw talents out. মূলতঃ এর অর্থ হচ্ছে অবগতি ও জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ।

শিক্ষার সংজ্ঞায় বিভিন্ন মনীষীর বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় ইসলামী শিক্ষা। কাজেই ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞায় বলা যায়- ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হ'ল ইসলামী শিক্ষা। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার স্বীয় আত্মাকে ও মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে জানতে ও চিনতে পারে তাই হ'ল ইসলামী শিক্ষা।

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ মানুষ হিসাবে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতঃ তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে পার্থিব জগতে সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং পরকালে চিরসুখের আধার জান্নাত লাভ করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক। ইসলামী শিক্ষা তথা শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্ব ও

প্রয়োজনীয়তার কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বপ্রথম শিক্ষাদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'এবং তিনি আদমকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন....' (বাক্বারাহ ৩১)।

আমাদের নবী (ছাঃ) হেরা গুহায় প্রথম যে প্রত্যাদেশ বা অহি প্রাপ্ত হন তাও কিন্তু اقرأ বা পড়া দিয়ে আরম্ভ।

তাছাড়া ছহীহ হাদীছে শিক্ষার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বিধৃত রয়েছে। যেমন- এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ যার দ্বারা কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'(বুখারী ও মুসলিম)। এথেকে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

আর ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সেহেতু তাতে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহ সকল বিষয়ের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই সঠিক, সুনিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামী শিক্ষার উৎসঃ কুরআন ও হাদীছ এ দু'টি ইসলামী শরীয়তের মৌল উৎস। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ' (মুয়াত্তা, মিশকাত বৈরুত ছাপা হা/১৮৬)। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার উৎস হবে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তথা হাদীছ।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ কুরআন মাজীদে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সূরা তওবার ১২২নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেন কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্য বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেন নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে'।

এছাড়া কুরআনের অন্যান্য স্থানে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে তার আলোকে বলা যায়, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্কে জানা, আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্য নিজেকে তৈরী করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল রূপে গড়ে তোলা এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

ইসলামী শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যঃ

১. জ্ঞানের মূল উৎস অহি। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা-ব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত। আর এটাই ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান ও মূল বৈশিষ্ট্য।

২. মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। কারণ মাতৃভাষায় সহজেই সব কিছু বুঝা যায়। তবে সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। কিন্তু তা বুঝতে ও বুঝাতে হবে জাতীয় ভাষায়। নবী-রাসূলগণ প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় তথা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেন সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে' (ইবরাহীম ৪)।

৩. যেহেতু ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস আল-কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই কুরআন পড়া শিখাতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষাদান করতে হবে।

৫. দ্বীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৬. শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।

৭. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

৮. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী ও কর্মমুখী।

৯. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক।

১০. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (World outlook) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার-আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিষ্টাচারের জন্য আলাদা মার্কস থাকবে।

১২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৩. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।

১৪. অবাধ সহশিক্ষা বন্ধ করে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।

১৬. নৈশকালীন বয়স্ক শিক্ষা ক্লাশ চালু করতে হবে।

১৭. সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ তাফসীরসহ কুরআনের নির্বাচিত অংশ এবং নির্বাচিত সংখ্যক হাদীছ শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।

১৮. উচ্চশিক্ষা হবে গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী।

১৯. সকল বিভাগের ছাত্রদেরকে ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখাবার ব্যবস্থা থাকবে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

২০. ছাত্রদের গড়ে তোলা হবে মর্দে মুজাহিদ রূপে।

২১. শিক্ষা প্রশাসন হবে দুর্নীতিমুক্ত, সহজ, গতিশীল ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক।

২২. দেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে।

২৩. সর্বোপরি শিক্ষানীতি হবে ইসলামী সংস্কৃতির উৎসস্থল। শিক্ষার সকল স্তরে ও সকল বিভাগে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

বস্তুবাদী শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষাঃ পৃথিবীব্যাপী যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, অবণতি এবং দুর্দশা আমরা লক্ষ্য করছি তা বস্তুবাদী শিক্ষার অশুভ পরিণতির ফল। কারণ যে শিক্ষা আল্লাহ বিমুখ তথা নাস্তিক্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঈমানী দর্শন বর্জিত, জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ, প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ তা কোন দিন কল্যাণকামী ও বিশ্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা হ'তে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পূর্ণিমা শশীর ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মবিবর্জিত তথা অনৈসলামী শিক্ষার অনিবার্য কুফল হিসাবেই সারা পৃথিবীতে ক্রমে নৈতিক অবক্ষয়ের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ছে। কারণ Secular education– Body, mind and soul-এর সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। বরং এই শিক্ষা যা দিচ্ছে তা দিয়ে শুধু শারীরিক উন্নতিই সম্ভব। আর শুধুমাত্র শারীরিক উন্নয়নের ফল মহাকবি ইকবালের ভাষায়- 'জ্ঞান যদি নিয়োজিত হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য তবে এ জ্ঞান হবে এক বিষধর সর্প'।

এক্ষণে এই মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার। এই পৃথিবীতে বস্তুবাদী শিক্ষার কবর রচনা করে তদস্থলে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহ'লেই পৃথিবীতে শান্তির ঝিরঝিরে সমীরণ প্রবাহিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষ দখল করে নেয়, তখন থেকে তারা এদেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, যে শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের গোলাম হিসাবে তৈরী হবে। ১৯৩৬ সালে লর্ড মেকেলের বক্তব্যে এ মনোভাবের প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছিলেন- "We must at present do our best to form a class, who may be interpreters between us and millions, whom with we govern, a class of persons. Indian in blood and colour but English in taste, in openion, in moral and intellect". অর্থাৎ 'বর্তমানে আমাদের সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও আমাদের লক্ষ লক্ষ প্রজার মধ্যে দূত হিসাবে কাজ করতে পারে। এরা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু মেযাজে, মতামতে, নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ'।

বৃটিশ মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, "So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love at it". অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা কুরআনকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে দমানো বা পরাভূত করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের থেকে কুরআনকে কেড়ে নিতে হবে, না হয় তাদের হৃদয় থেকে মুছে দিতে হবে কুরআনের প্রেম ও ভালবাসা'।

মুসলমানের ঈমানী শক্তির মূল উৎস তারা বুঝতে পেরেছিল বলেই তাদের গোলাম বানানোর ও জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার জন্য **ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা** নামে তারা দ্বিমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেন। যা আজও এদেশে চালু আছে।

এক্ষণে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে সমৃদ্ধশালী ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হ'লে দ্বিমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা গুড়িয়ে দিয়ে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। অন্যথায় জাতি দিন দিন ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হ'তে থাকবে।

শেষকথাঃ জাতির নৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার। নৈতিকতা বর্জিত নিছক বস্তুবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় কখনোই সুনাগরিক সৃষ্টি হ'তে পারে না। বরং উক্ত শিক্ষাকেই সে পরোপকার বা জাতির কল্যাণে না লাগিয়ে নিজের হীন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত করে, যার তিক্ত অভিজ্ঞতা অফিস-আদালতে, রাস্তা-ঘাটে এমনকি পারিবারিক জীবনেও আমরা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি।

বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় দক্ষ কর্মী তৈরীর কিছু প্ল্যান থাকলেও আল্লাহর জবাবদিহিতার দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন খাঁটি ঈমানের বলে বলীয়ান দক্ষ ও আদর্শ কারিগর তৈরীর কোন পরিকল্পনা সেখানে নেই। ফলে যথেষ্ট যোগ্য লোক থাকা সত্ত্বেও দেশ আজ ক্রমেই গভীর অরাজকতার দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষিতরাও সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসাবে বেরিয়ে আসতে পারছে না। তাই উপরোক্ত দ্বিমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সারাদেশে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু একান্ত প্রয়োজন ও সময়ের অনিবার্য দাবী।

❁❁❁❁❁❁

বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ

প্রতিবেদন

(ফেব্রুয়ারী'৯৯ - আগষ্ট ২০০০)

গঠনতান্ত্রিক নিয়মে দু'বছর অন্তর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘর নতুন সাংগঠনিক সেশন শুরু হয়। সে মতে ১৯৯৯ইং সনের ২৮ই ফেব্রুয়ারী হ'তে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলতি সেশনের মেয়াদ। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত পরামর্শ করে ১৯৯৯-২০০১সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও গত সেশনের তাবলীগ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমন (বগুড়া) কে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে মনোনীত করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান মীযান (কুষ্টিয়া) সহ-সভাপতি, মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা) সাধারণ সম্পাদক, এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা) সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূক (সাতক্ষীরা) অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর (সাতক্ষীরা) প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ) কে দফতর সম্পাদক মনোনীত করে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করেন।

বলা আবশ্যক যে, সেশনের শুরু থেকে কেন্দ্রীয় পরিষদের তাবলীগ এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এই দু'টি পদ শূন্য থাকে। এ শূন্য পদ পূরণের জন্য দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামকে তাবলীগ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করা হয় এবং একই সাথে তাকে দফতর সম্পাদক এর দায়িত্ব দেয়া হয়। অপর দিকে প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল গফুরকে একই সাথে সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক -এর দায়িত্বও দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত গত ২রা সেপ্টেম্বর২০০০ কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানকে তার দায়িত্ব হ'তে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তদস্থলে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাবীবুর রহমান মীযানকে ১৯৯৯-২০০১ সেশনের জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে মনোনীত করেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

শুরু হয় সাধ্যানুযায়ী এ সেশনে যুবসংঘের দুর্বার অগ্রযাত্রা। পরকালীন জবাবদিহিতাকে স্মরণ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে সর্বদা আন্তরিকভাবে সংগঠনকে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পরিষদ পরিকল্পিত ভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ কর্মপরিষদের কার্যকালে আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি ও সংগঠন সম্প্রসারণে কতখানি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা এ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা অসম্ভব। তাই আমরা এতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিশেষ দিকের আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রচারঃ প্রচারেই প্রসার। যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের চারদফা কর্মসূচীর প্রথম দফা হ'ল তাবলীগ বা প্রচার । তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজের নিকটে তাওহীদের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের একক যুবসংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ দা'ওয়াত ও তাবলীগের বলিষ্ঠ কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। যেলা সংগঠনগুলো এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি যেলায় নিয়মিত তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা-এলাকায় সাপ্তাহিক বৈঠক ও অন্যান্য বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অপর দিকে যেলার উদ্যোগে সম্মেলন ও জলসার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বই-পত্র বিলি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে দেশে যুবক ও ছাত্রসমাজ ছাড়াও সকল পর্যায়ের মানুষের মাঝে নির্ভেজাল তাওহীদের দা'ওয়াত পৌঁছানো হয়। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং অসংখ্য পথহারা যুবক সঠিক পথের দিশা পেয়ে এ সংগঠনে যোগদান করে, ফালিল্লাহিল হামদ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের নির্দেশে সকল সাংগঠনিক যেলা স্ব স্ব যেলা ও থানা সদরে সংগঠনের আদর্শিক শ্লোগান সমূহ দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে সংগঠনের ব্যাপক প্রচার ঘটে।

সংগঠনঃ বিচ্ছিন্নভাবে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক মজবুতি ও দক্ষ জনশক্তি। সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান ক্বায়েম করতে হ'লে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এ সত্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের চলতি সেশনের দায়িত্বশীলগণ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ ১৯৯৯-২০০১ ইং সেশনের জন্য প্রতিটি সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন কর্মসূচী সফল করেন। নতুন দায়িত্বশীল পরিষদ নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়। নিম্নে সাংগঠনিক যেলা সমূহ এবং সভাপতি ও আহবায়কবৃন্দের নাম উল্লেখ করা হ'লঃ

সভাপতি	যেলা
১। মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন	নরসিংদী
২। মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী	খুলনা
৩। মুহাম্মাদ আনোয়ার এলাহী	সাতক্ষীরা
৪। মুহাম্মাদ তারিকুয্যামান	মেহেরপুর
৫। মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল	দিনাজপুর পঃ
৬। মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ	দিনাজপুর পূর্ব
৭। মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন	নাটোর
৮। মুহাম্মাদ মাজেদুল ইসলাম	কুষ্টিয়া পশ্চিম
৯। মুহাম্মাদ আব্দুল মোমিন	কুষ্টিয়া পূর্ব
১০। মুহাম্মাদ মোদ্দাচ্ছের হোসাইন	যশোর
১১। মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব	বগুড়া
১২। মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান	পাবনা
১৩। মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন	সিরাজগঞ্জ
১৪। মুহাম্মাদ ওমর ফারুক	জামালপুর
১৫। মুহাম্মাদ আব্দুল মুত্তালিব	রাজবাড়ী
১৬। আহমাদ শরীফ	কুমিল্লা
১৭। হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ	ঢাকা
১৮। মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	নীলফামারী
১৯। মুহাম্মাদ মুস্তাযির রহমান	লালমনিরহাট
২০। মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইন	কুড়িগ্রাম
২১। মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন	গাইবান্ধা পূর্ব
২২। মুহাম্মাদ মোস্তফা আলী	জয়পুরহাট
২৩। মুহাম্মাদ আবু মূসা আব্দুল্লাহ	নওগাঁ
২৪। হাঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম	গাইবান্ধা পশ্চিম
২৫। মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান	বাগেরহাট
২৬। মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাস	গাজীপুর
২৭। মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন	রাঃ বিশ্ববিদ্যালয়
২৮। মুহাম্মাদ এরশাদ আলী	রাজশাহী
২৯। মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম	রংপুর
৩০। মুহাম্মাদ ইলিয়াছ আলী মোল্লা	ফরিদপুর
৩১। মুহাম্মাদ সাখাওয়ত হোসাইন	গোপালগঞ্জ
আহবায়ক	**যেলা**
৩২। মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক	পঞ্চগড়
৩৩। আহমদ হোসাইন	সিলেট
৩৪। মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম	টাঙ্গাইল
৩৫। মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ	ঝিনাইদহ
৩৬। মুহাম্মাদ মুস্তফা আলী	ঠাকুরগাঁও
৩৭। মুহাম্মাদ আলী	ময়মনসিংহ

তাছাড়া শেরপুর, চট্টগ্রাম ও নারায়নগঞ্জে সংগঠনের কাজ চলছে।

দ্বিতীয়তঃ সংগঠনের কাজকে গতিশীল করার জন্য সাংগঠনিক যেলাগুলোকে ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চলে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বশীল মনোনীত করা হয়। আঞ্চলিক দায়িত্বশীলগণ নিজ অঞ্চলের সাংগঠনিক যেলায় কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সফর ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তৃতীয়তঃ মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে দুই সদস্য বিশিষ্ট চারটি টীম সকল যেলায় সফর করেন। যেলা দায়িত্বশীলদের সংগঠনের কাজকে গতিশীল করার জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

চতুর্থতঃ বর্তমান কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ যেলা সমূহের অফিস অডিট করার জন্য কর্মসূচী হাতে নেয়। এ পর্যন্ত বেশির ভাগ যেলায় অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বাকী যেলা সমূহে অডিট কার্যক্রম অতিশীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশিক্ষণঃ জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অহি-র বিধান বাস্তবায়নের জন্য চাই একদল যোগ্য কর্মী। আর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ প্রশিক্ষণমূলক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। যা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

তিন দিনব্যাপী দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণঃ যেলাসমূহ পূনর্গঠনের পর যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দু'পর্বে তিন দিনব্যাপী দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীলদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ফলে দায়িত্বশীলদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার হয়।

অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণঃ কেন্দ্রের নির্দেশে আঞ্চলিক দায়িত্বশীলগণ নিজ অঞ্চলের যেলা সমূহের কর্মীদের যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। কোন কোন যেলায় দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে অঞ্চল সমূহের কর্মীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগে।

যেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণঃ কেন্দ্রের নির্দেশে যেলা সংগঠনের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এতে কর্মীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া যেলার নির্দেশে শাখা ও এলাকার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনশক্তিঃ দক্ষ জনশক্তি সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি। দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত লক্ষ্যার্জন আদৌ সম্ভব নয়। তাই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী ব্যবস্থা চলতি সেশনের দায়িত্বশীলবৃন্দ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কর্মীদের মানোন্নয়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১১৮ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭২ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে পরবর্তীতে চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে গঠনতন্ত্রে

বর্ণিত শর্তানুযায়ী ১০ জন কর্মীকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানে উন্নীত করা হয়। কর্মী মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ৫৮৮ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৮৪ জন। উল্লেখ্য যে, কর্মীদের কর্মতৎপরতার ফলে সংগঠনের সমর্থকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকাশনাঃ সংগঠনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে প্রকাশনা। প্রকাশনার মাধ্যমে সংগঠন যতখানি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, অন্য কোন মাধ্যমে ততখানি তড়িৎ সম্ভব হয়না। ইতিপূর্বে প্রকাশনা জগতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পালন করে যাচ্ছে। তারপরও এ সংগঠন প্রকাশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সংগঠনের উদ্যোগে পরিচিতি 'ক' , 'খ' ও প্রাথমিক সদস্য ফরম পুনঃপ্রকাশ করা হয়। মাহে রামাযান উপলক্ষে সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী ছেপে সাংগঠনিক যেলাসমূহে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া যুগের চাহিদা ও সংগঠনের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে আকর্ষণীয় বার্ষিক ক্যালেণ্ডার২০০০ সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। যা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা, ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ কর্তৃক আন্তরিক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

রচনা প্রতিযোগিতাঃ প্রতিযোগিতা প্রতিভা বিকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ হ'তে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের লক্ষ্যে দা'ওয়াত ও জিহাদের বলিষ্ঠ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। ফলে চলতি সেশনে সংগঠনের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড যদি অব্যাহত থাকে, তাহ'লে আগামী দিনে এদেশে অহিভিত্তিক সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদের এ সামান্য খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!!

❁❁❁❁❁❁

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৬

প্রতিবেদন

-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

একটি রীতি-নীতির পরিবর্তন অপর এক শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম আদর্শের সঠিক উপস্থাপনের দ্বারা হ'তে পারে। এ জন্য জাহেলী রসম ও রেওয়াজের বিপরীতে ইসলাম জাতির সামনে শ্রেষ্ঠ, যুগোপযুগি ও কল্যাণবহ উন্নততর এক আদর্শ উপস্থাপন করেছিল। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম বিশ্বের দরবারে সুপরিচিত ও শ্রেষ্ঠতম জীবনাদর্শ রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

ছাহাবায়ে কেরাম যেভাবে নিজেদেরকে ইসলামী আদর্শের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল রূপে দাঁড় করিয়েছিলেন; ঠিক অনুরূপ নিষ্ঠা ও আদর্শবান কর্মী ব্যতীত ইসলামী আদর্শের পুনঃবাস্তবায়ন কল্পনা করা যায়না। কজেই ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্থিতিশীলতা লাভ করতে হ'লে ইসলাম যে মৌলিক নীতিমালা উপহার দিয়েছে-তা আমাদেরকে অবশ্যই অনুকরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম *দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৬*-এ উদ্বোধনী ভাষণ দান কালে সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি **জনাব মুহাম্মাদ হারুণ** উপরোক্ত সুবিন্যস্ত শব্দমালা উপহার দেন। (এ ভাষণটি কর্মীদের জোর দাবীর প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে **"দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি"** নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়)।

গত ২৪ ও ২৫ শে অক্টোবর'৯৬ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী সংলগ্ন ময়দানে জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দু'দিনব্যাপী ১ম **দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন**। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তার সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি। উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল সাংগঠনিক মযবুতি। সংগঠনকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য যাঁর অবদান সর্বাধিক, তিনি হ'লেন অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তাঁর অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয় ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম কর্মী সম্মেলন যাঁর তত্ত্বাবধানে ও শক্ত হাতের পরিচালনায় সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছিল, তিনি হ'লেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের

তৎকালীন সফল সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হারুণ। তাঁর দিক নির্দেশনায় কর্মী সম্মেলন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। আর তা হ'ল সম্মেলনের শৃংখলা, মঞ্চসজ্জা, আসন পরিকল্পনা। এককথায় সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত। যার ফলে সম্মেলনে যোগদানকারী সকল কর্মী ও সুধীজনের অশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিল সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটি। যে কারণে সম্মেলনোত্তর সারাদেশে যুবসংঘের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই বলা যায়, দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৬ ছিল যুবসংঘের সাংগঠনিক গতিবৃদ্ধির জন্য এক অতুলনীয় মাইল ফলক।

২৪শে অক্টোবর'৯৬ সকাল ১০টায় ক্বারী নেছার আহমাদের সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের পর সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যম যথারীতি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

এরপরে বক্তব্য পেশ করেন জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহ আবদুল মতিন, শায়খ আবদুস সামাদ সালাফী, সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পক্ষ থেকে শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতিদের পক্ষ হ'তে শায়খ আবদুর রশীদ ও মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতের পরে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আবদুস সামাদ সালাফী। বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত ও অকৃত্রিম আদর্শের প্রতি কর্মীদের অনুরাগ সৃষ্টি ও সংগঠনের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও জিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ কর্মীরূপে গড়ে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন।

এ কর্মী সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বক্তাদের বক্তব্যের মাঝে মাঝে আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্যদের সুললিত কণ্ঠে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন, যা আড়ম্বরপূর্ণ সম্মেলনকে আরো উজ্জীবিত করেছিল। কর্মীদের করে রেখেছিল সদা প্রাণচঞ্চল।

সম্মেলনের এই জনারণ্যে ও আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যেও যেন এক শূন্যতা বিরাজ করছিল, কর্মীদের মুখেও পরিলক্ষিত হচ্ছিল মলিনতার সুস্পষ্ট ছাপ। এর কারণ ছিল, সম্মেলনের প্রধান অতিথি ও প্রধান আকর্ষণ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতার অসুস্থতা জনিত কারণে অনুপস্থিতি। কিন্তু সকলকে হতবাক করে দিয়ে দীর্ঘ অসুস্থতা সত্ত্বেও ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করে সুদূর ঢাকা থেকে রাজশাহী বিমানবন্দরে এসে নামলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এ সংবাদ পেয়ে সম্মেলনে উপস্থিত কর্মীদের এক বিরাট মিছিল বিমান বন্দরে পৌঁছে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য। সেদিন কর্মীদের **"আল্লাহু আকবার"** ধ্বনি এবং **"সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর"**, **"মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ"** প্রভৃতি গগণবিদারী শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছিল রাজশাহী বিমানবন্দর।

চতুর্দিকে কর্মীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমীরে জামা'আত সম্মেলন প্যাণ্ডেলে উপস্থিত হ'লেন। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বাস-ট্রেন যোগে আগত সহস্রাধিক কর্মী। সাথে সাথে তাদের মুহূর্মুহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে নওদাপাড়া এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

এরপরে সকলের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দিতে সবার কাংখিত আলোচক মুহতারাম আমীরে জামা'আত বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত হ'লেন এবং গভীর আবেগ জড়িত কণ্ঠে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ চমৎকার আলোচনা শ্রোতামণ্ডলীকে উপহার দেন। তিনি তাঁর আলোচনায় বলেনঃ ***"বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এককথায় ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান একটি উল্কাপিণ্ডের ন্যায়। সভ্যতা, মানবতা ও ন্যায়বিচার বর্তমানে ভূ-লুণ্ঠিত। অন্যায়কারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে ন্যায়পন্থিরা আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টির মূল কারণ একটাই ---। আর তাহ'ল ঈমানহীনতা।"*** তিনি আরো বলেনঃ ***"বর্তমান মুসলিম সমাজ আজ তার দায়িত্ব অনেকাংশে ভুলতে বসেছে এবং পাশাপাশি ভোগবাদী আদর্শ ও সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবিদের সৃষ্ট ধূম্রজালে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। আমি মনে করি এদেশে বর্তমানে বস্তুগত দারিদ্রের চাইতে বিশ্বাসগত দারিদ্রই প্রকট আকার ধারণ করেছে। ঈমানের দারিদ্র হ'তে তাই আমদের অবশ্যই মুক্ত হ'তে হবে।"*** (আমীরে জামা'আতের পূর্ণ ভাষণ অত্র স্মরণিকায় মুদ্রিত হয়েছে।)

আমীরে জামা'আতের এই ভাষণ শ্রোতাদের মনকে বিগলিত করেছিল, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করেছিল, সমাজ-সংস্কারের এ আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হওয়ার দৃপ্ত শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আমীরে জামা'আতের বক্তব্যের পরে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ হারুণ-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত কর্মীবৃন্দ সংগঠনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মী সম্মেলনে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ছাত্রদের তৈরী নয়নাভিরাম কারুকার্য। রংবেরঙের আরবী-বাংলা হরফে লেখা **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন সফল হোক'**, **"اهلا سهلا ومرحبا"**

'মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ' প্রভৃতি শ্লোগান সকলের নযর কেড়েছিল। মাটিতে বালির উপরে রং ছিটিয়ে লেখা এসব সুদৃশ্য কারুকার্য দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে ছাত্রদের মারহাবা জানিয়েছিলেন, তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রাণ খুলে দো'আ করেছিলেন।

অত্র সম্মেলনে সকল কর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থনের ভিত্তিতে কতিপয় দাবী সম্বলিত প্রস্তাবনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবনা ও দাবীসমূহ নিম্নরূপঃ

১। আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দেশের আইন ও শাসন চাই।

২। দেশের স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাসে ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই-পত্র সিলেবাস ভুক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কিতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

৩। ধূমপান, মাদক সেবন, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণপ্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য প্রচার কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

৫। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৬। ফারাক্কা বাঁধের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় রাজশাহীসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিনত হ'তে শুরু হয়েছে ও দেশের সমস্ত জনগণের জীবন-মরণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় অথবা পাল্টা বাঁধ নির্মাণের জন্য অত্র সম্মেলন সরকারের নিকটে জোর দাবী জানাচ্ছে।

৭। এই সম্মেলন কাশ্মীর, বসনিয়া, সোমালিয়া, ইরত্রিয়া ও চেচেনিয়ায় মুসলিম নিধন এবং আফগানিস্তানে উপদলীয় কোন্দল বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

৮। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার, ভারত হ'তে বিদ্যুৎ আমদানী এবং দেশের বুক চিরে ভারতকে ট্রাঞ্জিট দেওয়ার মাধ্যমে খাল কেটে কুমির আনার সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

৯। ইসলামী শিক্ষা সংকোচননীতি গ্রহণ করা ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সরাসরি আঘাত করার শামিল। বর্তমানে দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্র সম্মেলন ইসলামিয়াত বিষয়ে ১০০ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বর চালু করার সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জোর আহবান জানাচ্ছে।

১০। এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এবং বাংলাদেশের সকল গবেষণা কেন্দ্রে ইসলাম বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে মহমান্য প্রেসিডেন্টের সময়োচিত ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং ছাত্রদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হীন স্বার্থে ব্যবহার না করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

[illegible]

-نورالاسلام (نوبه بارا مدرسة)

يا نبيل العلماء فى عصرنا ❋ يافقيه الفقهاء فى دهرنا

انا فقدناك يا حسراتنا ❋ كأن البرق لمع فى رأسنا

والله قد فجع فؤادنا ❋ فى موت محدث عصرنا

كم عالم يفيد بكتب شيخنا ❋ حيث لا يعد اصبعنا

والله نسأل ان ينيل فقيدنا ❋ جنة الفردوس ورحمة ربنا

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Advice

-Husain Al-Mahmud
(Nawdapara Madrasah)

If you want Heaven after die,
You don't talk any times lie.
It's a great medicine of religion,
Remove from sickness of atheism.
It's the mother of all vices,
'Desert it' cheif of our prophet advices.
If you obey his circulars minutely
Allah bestow thee heaven undoubtedly.
Oh our allmighty great maker Allah!
Include us your beloved theist,
Don't sink us in the group of atheist

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (১৯৭৮-২০০০)

-এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাকাল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮। এর প্রতিষ্ঠতা আশির দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ছাত্র, আহলেহাদীছ জামা'আতের রত্ন জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠন ছাত্র, তরুণ ও যুবকদের নিকট দ্বীনে হক্বের দা'ওয়াত পেশ, ঘুমন্ত আহলেহাদীছ জামা'আতকে জাগ্রত করা এবং আপামর জনসাধারণের নিকট ইসলামের শাশ্বত রূপ তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঘড়ির কাটার মত টিক টিক করতে করতে এ সংগঠন তার জীবন প্রবাহের ২২টি বছর পার করে দিয়েছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনাও ঘটে গেছে। অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে এ সংগঠন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে এটি "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ"-এর অঙ্গসংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নিম্নে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা হ'লঃ

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৩৮৫ ও হিজরী ১৩৯৮) রোজ রবিবার ৭৮, উত্তর যাত্রা বাড়ীস্থ মাদরাসা মোহম্মাদীয়া আরাবিয়া সংলগ্ন মসজিদে এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি। উক্ত সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন কৃতীছাত্র জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আহবায়ক করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। শুরু হয় আহলেহাদীছ যুবসংঘের যুবক ও ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ জিহাদী কফেলার দীপ্ত পদচারণা। দেশময় ছড়িয়ে পড়ে সংগঠনের দা'ওয়াত। দেশের সকল পর্যায়ের আহলেহাদীছ বিদ্বান ও ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হ'তে, বিশেষ করে মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের আহলেহাদীছ জনগণের তরফ হ'তে লাভ করে অকুণ্ঠ সমর্থন।

কমিটি গঠনের তিন মাসের মধ্যেই আহবায়ক ছাহেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ব্যানারে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু মুসলিম ভাইদের জন্য ঢাকার মহল্লায়-মহল্লায় ও রাজপথে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অতঃপর ১২ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত ১২ সদস্যের একটি টীম আহবায়কের নেতৃত্বে নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইদের সাহায্যার্থে টেকনাফ থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। তাঁরা সেখানে টেকনাফ, উখিয়া, নাইখংছড়ি প্রভৃতি এলাকার উদ্বাস্তু শিবিরে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন। এই বার দিনে চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে আহলেহাদীছ যুবসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, প্রতিদিন বাদ মাগরিব বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরের মসজিদে হিম্মতহারা রোহিঙ্গা ভাইদের মাঝে উর্দুতে গালিব ছাহেবের জিহাদী বক্তৃতা ও অকুণ্ঠ সেবা প্রদানের ফলে সকল মহলে আহলেহাদীছ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসঃ বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণীর 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' বইয়ে 'আহলেহাদীছগণ ইসলামের পঞ্চম মাযহাব এদের ইমাম দু'জন .....'। এই মর্মে পাকিস্তান হ'তে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত হয়ে আসছিল, তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। দীর্ঘ আড়াই বছর একটানা আন্দোলনের মুখে যুবসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৮১ সালের জুন সংস্করণে তা যথারীতি সংশোধিত হয়।

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল ছিল বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিনে রাজধানী ঢাকার বুকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম জাতীয় সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী। পরের দিন সকালে বংশাল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বিকালে ঢাকা 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন হল'-এ যুবসংঘ কর্তৃক আয়োজিত "তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে যুবসংঘের আহবায়ক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সেমিনারে তৎকালীন সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খত্বীব সহ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা হ'তে বহু বুদ্ধিজীবি ও ওলামায়ে কেরাম আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ক্বায়েমের জন্য সরকারের নিকটে দাবী জানানো হয়। সম্মেলন শেষে ঢাকার রাজপথে ট্রাক মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগান ধ্বনি এবং বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদে 'আমীন'-এর আওয়ায সেদিন রাজধানীর বুকে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যেন নতুন প্রাণ দান করেছিল। উল্লেখ্য যে, ঢাকায় আহলেহাদীছ মহল্লার বাইরে আহলেহাদীছদের এধরণের কোন প্রকাশ্য সম্মেলন এটাই প্রথম বলে ধরে নেওয়া হয়।

১৯৮০ সালের জুন মাস। কবর পূজার বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঢাকায়

প্রথম ঐতিহাসিক মিছিল বের হয়। এতে কবর পুজারীদের হামলায় যাত্রাবাড়ী মাদরাসার তৎকালীন ছাত্র সাজ্জাদুল করীমের একটি হাত ভাঙ্গে এবং মাদরাসাতুল হাদীছের ছাত্র আবুল কাসেমের একটি চোখ দারুণভাবে যখম হয়।

'৮০ সালের আগষ্ট মাস। টাঙ্গাইলের চার এলাকা এবং গোদাগাড়ী (রাজশাহী) এলাকায় বণ্যা দূর্গতদের মধ্যে যুবসংঘের যুগ্ম আহবায়ক জনাব শামসুদ্দীনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টীম ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

'৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। লণ্ডনের 'নিউজ উইক' পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি ছাপার জন্য ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করার জন্য ডান ও বাম সকল মুসলিম রাজনৈতিকদের যুবসংঘের পক্ষ হ'তে বংশাল জামে মসজিদে আয়োজিত সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রন জানানো হয়। সে আলোকে অন্যদের নিকট থেকে ভালই সাড়া পাওয়া যায়। উক্ত সম্মেলনে আল্লাহর নবী (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি ছাপার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

১৯৮১ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের আহবায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মহিলাদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা শহরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গঠন করেন। সে সময় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযনফর। এর প্রথম সভানেত্রী ছিলেন স্নিগ্ধা হক্ব (এম.এ) এবং সম্পাদিকা ছিলেন হালিমা খাতুন। শুরু হয় মহিলা অঙ্গনে জোরদার কার্যক্রম। ফলে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এ সংগঠনের দা'ওয়াতী কাজ। বলা বাহুল্য এ সংগঠনের সকল সংবাদ ঐ সময় সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। এমনিভাবে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সংগঠন দেশের বিভিন্ন যেলাতে মহিলাদের মধ্যে তার সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আল্লাহ চাইলে তাদের একাজ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ইনশা আল্লাহ।

'৮২ সালের ডিসেম্বর মাসঃ ঢাকাতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সম্মেলনে দেশে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী আইন ও শাসন চালু করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

'৮৩ এপ্রিলঃ দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নগ্ন ছবি, ভি.সি.আর ও চরিত্র বিধ্বংসী যৌন সুড়সুড়ী মূলক সাহিত্যের সয়লাব বন্ধের জন্য সরকারের নিকট দাবী পেশ করা হয়।

জুন'৮৩ ঢাকার হাইকোর্ট মাযার প্রাঙ্গনকে দেশের জাতীয় ঈগাহের মর্যাদা প্রদানের সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে পত্রিকায় কড়া বিবৃতি প্রকাশ করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সাথে সাথে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবী জানানো হয়।

'৮৪ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা বৈঠকে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজশাহীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ৪ঠা মে'৮৪তে রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেটের তৃতীয় তলায় যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

জুন'৮৪ঃ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ক্বায়েমের দাবীতে 'রামাযানের ডাক' শিরোনামে রাজধানী সহ সারা দেশে ব্যাপক পোষ্টারিং করা হয়। অবশ্য এর পর থেকে প্রায় প্রতি বছর রামাযান মাসে আমাদের আহ্বান নামে একটি পোষ্টার বের করা হচ্ছে।

৩১শে আগষ্টে'৮৪ঃ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে নতুন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ দিনে যুবসংঘের একটি 'মুখপত্র' বের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২২শে অক্টোবর'৮৬ বুধবার কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন রাণী বাজার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬। উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সম্মেলনে সভাপতির প্রদত্ত অমূল্য ভাষণ উপস্থিত সুধী মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়। পরবর্তীতে তা 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' ও 'তিনটি মতবাদ' নামে আলাদা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় যুবসংঘের ৫ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন। এ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নবনির্বাচিত কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী। এমনিভাবে চলতে থাকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের অগ্রযাত্রা। শুরু হয় পথহারা আহলেহীছ ছাত্র ও যুবকদের ঘরে ফেরা। এখনো যার গতি অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যেভাবে এ সংগঠন আহলেহাদীছ যুবসমাজকে সকল প্রকার বাতিল মতাদর্শ ত্যাগ করে নিঃশর্তভাবে এবং পরকালীন স্বার্থে নির্ভেজাল অহি অনুসারে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ার আহবান জানিয়ে আসছিল, বেশী দিন আর তাদের সে উদ্যম টিকে থাকলো না। তাদের সে প্রচণ্ড গতির মুখে পদ্মার উজানে ফারাক্কা বাঁধের মত বিপদ এসে উপনীত হ'ল। হঠাৎ ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই আরাফাতের পাতায় জমঈয়তের সাথে যুবসংঘের সমস্ত প্রকার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা হ'ল। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের আহলেহাদীছ জনতা আরাফাত খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

বলা আবশ্যক যে, জামা'আতকে বিভক্ত করার সাথে সাথে যুবসংঘ ও তার উপদেষ্টাদের উপরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় যুলুম ও নির্যাতন। প্রথমেই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা

শায়খ আবদুল মতীন সালাফীকে মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যুবসংঘের অন্যতম উপদেষ্টা শায়খ আবদুস সামাদ সালাফীকে খোড়া অজুহাতে মাদরাসার সেক্রেটারী কর্তৃক শোকজ করে, পরে তাঁকে মাদরাসা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। অথচ রাণী বাজার মাদরাসায় তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। রাণী বাজার অফিস থাকা কালীন যুবসংঘের দু'টি সাইনবোর্ড খুলে নেয়। পানির লাইন বন্ধ করে দেয়, বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দেয়। তার পরেও রাজশাহীর প্রচণ্ড উত্তাপে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিরবে সব কিছু হজম করে কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে এসেছে। এমনিভাবে দেশের বিভিন্ন যেলাতে দাঁড়ী রাখার কারণে, ছালাতান্তে সম্মিলিত মুনাজাতে শরীক না হওয়ার কারণে বহু কর্মী নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছে। অনেকের ইফতার মাহফিলের গরু কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সাইকেল চুরি করা হয়েছে, মসজিদে দ্বীনের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও আমাদের কর্মীরা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ঘরের বাধার পাশাপাশি বাইরে থেকেও বাধা আসতে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে তাকলীদপন্থী, পীরপন্থী ভাইদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার বাধা আসতে শুরু হয়েছে। কিন্তু অত্রসংগঠনের কর্মীরা সমস্ত প্রকার বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে একমাত্র পরকালীন মুক্তির স্বার্থে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ কাফেলার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, সম্পর্কহীনতা ঘোষণার পর এ সমস্যা নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার ফলাফল একই হয়েছে। জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায়নি। তারা যুবসংঘকে শুধু বহিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে যুবসংঘকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২৮ শে নভেম্বর "শুব্বানে আহলেহাদীছ" নামে একটি নতুন যুবসংগঠন খাড়া করে। কিন্তু বাংলার আহলেহাদীছ যুবসমাজ সেদিন তাদের সে ধোঁকায় না পড়ে আহলেহাদীছ যুবসংঘকেই গ্রহণ করে, যা আজও বাংলাদেশের যুবসমাজের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে। বিচ্ছিনতা ঘোষণার পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা ও পদক্ষেপ গ্রহণের পরেও যখন কোন ভাবেই ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হ'ল না, তখন **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** তার উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** নামে একটি প্রতিনিধিত্বশীল মুরব্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ উক্ত সংগঠনের অংগ সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঐ একই তারিখে দেশের শিশু-কিশোরদের মাঝে অহি-র দা'ওয়াত পৌঁছানো এবং সে মোতাবেক ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯২ সালে ১৯ থেকে ২২ শে জানুয়ারী চার দিনব্যাপী কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবাহ আস-সালেম আস-সাবাহ মিলনায়তনে আয়োজিত ইসলামী বিশ্ব সম্মেলনে কুয়েত 'সরকারের আমন্ত্রণে ৩৫ টি দেশ হ'তে ৪২২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বাংলাদেশের সাত জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের তৎকালীন উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের আমীর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব অন্যতম। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত মেহমানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বক্তব্য পেশ করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সার্বিক কর্মকাণ্ড অতি সংক্ষেপে ও অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর ঐ ভাষণটি ক্যাসেট থেকে সংগ্রহ করে জাতীয় সম্মেলন'৯৩ স্মরণিকায় হুবহু ছাপানো আছে।

২০শে এপ্রিল'৯২তে আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদের নেতৃত্বে ১৩টি সাংগঠনিক যেলার কর্মীদের সমন্বয়ে একটি টীম দ্বিতীয় বারের মত সপ্তাহব্যাপী টেকনাফ উপকূলবর্তী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবির গুলোতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালে সংগঠিত স্মরণ কালের শ্রেষ্ঠ বণ্যায় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কেন্দ্রীয়ভাবে ত্রাণ ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহের পরে তা বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করে।

১৯৯৪ সালের ২১শে এপ্রিলে খুলনা প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে বক্তব্য পেশ করেন, তা সুধী মহল বিশেষ করে সাংবাদিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পরের দিনের সংবাদপত্রগুলোতে। বিভিন্ন পত্রিকা বিভিন্ন শিরোনামে ঐ খবর প্রকাশ করে। কোন কোন পত্রিকা "অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন চাই", "দল ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শোষণের রাজনীতি-ডঃ গালিব", কোন পত্রিকা, "জামাতের আন্দোলনের সাথে আমরা একমত নই- ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব" ইত্যাদি শিরোনামে সেদিনকার সংবাদ প্রকাশ করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাতির সামনে উপস্থাপন করে। দুর্ভাগ্য যে, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ইত্তেফাক, দ্যা ডেইলী অবজারভার ও দৈনিক মিল্লাতের

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সাংবাদিকগণ উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা সত্তেও তাদের কোন পত্রিকায় কোন রিপোর্ট আসেনি।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলন সচেতন নাগরিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এক ধরণের ইসলামপন্থীদের গাত্রদাহ শুরু হয়। যার ফলে পরের দিন সিটি করপোরেশন মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে (অবশ্য সম্মেলন হাদীছ পার্কে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে স্থান পরিবর্তন করা হয়।) ঐসব কথিত ইসলামপন্থীদের অদৃশ্য ইংগিতে প্রেরিত খুলনা আলিয়া মাদরাসা ও দারুল উলুম মাদরাসার কিছু উশৃংখল ছাত্র সম্মেলনকে পণ্ড করার পুর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হৈ চৈ শুরু করে। যদিও তাদেরকে আমাদের কর্মীসহ সাধারণ জনগন গণপিটুনী দেওয়ার পরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

এখানেই শেষ নয়, তারা সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই পোষ্টার দেখে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে এক নম্বর আসামী করে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য, উক্ত সম্মেলনে সাতক্ষীরার (কলারোয়া) অধ্যাপক নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও তাঁর নামে মামলা করা হয়। শুধু তাই নয়, পরদিন তথাকথিত 'খুলনা যেলা ইমাম পরিষদের' পক্ষ হ'তে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং ২৯শে এপ্রিল বাদ জুম'আ স্থানীয় ডাকবাংলা মোড়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে উত্তেজনাকর ভাষায় বিজ্ঞাপন ছাড়া হয়। অবশ্য আল্লাহর অশেষ রহমতে উক্ত মামলায় সকলকে বেকছুর খালাস দেওয়া হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত ইমাম পরিষদই গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০ খালিশপুর আহলেহাদীছ মসজিদ ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দেয়। তারা পবিত্র কুরআন-এর তাফসীর এবং হাদীছের মহামূল্যবান কিতাবগুলো যেভাবে ছিড়ে ছুটে আশপাশের পঁচা দুর্গন্ধময় ড্রেনে নিক্ষেপ করে, যা কোন বিধর্মীরাও করতে পারেনা।

১৯৯৪ সালের ২৯শে জুলাইঃ পবিত্র কুরআন সংশোধন ও পরিবর্তনের দাবীদার মুরতাদ লেখিকা তাসলিমা নাসরীন ও তার দোসর ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহুত দেশব্যাপী ঐতিহাসিক লংমার্চ শেষে মানিক মিয়া এভিনিউতে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের পক্ষ হ'তে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মাত্র দু'মিনিট সারগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদাণ করেন। সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার কাছে জানতে চান, "আপনারা কি আল্লাহ্র অহি-র ভিত্তিতে এদেশের শাসন ব্যবস্থা চান? সমস্বরে আওয়াজ ওঠে-'চাই'। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত মহাসমাবেশে শৃংখলা বিধানও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিযুক্ত আমাদের কর্মীরা ষ্টেজের নিকট থেকে দু' দু'টি টাইম বোমা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ '৯১ হ'তে '৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা করে আসছিল। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠিত হওয়ার পর, ১৯৯৬ সাল হ'তে এ দায়িত্ব উক্ত সংগঠন অদ্যাবধি পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি বৎসরই দেশের বিভিন্ন যেলা ও এলাকা সম্মেলন সহ বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'৯৬**। এটি যুবসংঘের প্রথম জাতীয় কর্মী সম্মেলন (যার রিপোর্ট অত্র স্মরণিকাতেই প্রকাশিত হ'ল)। প্রায় প্রতিটি জাতীয় সম্মেলনে এ সংগঠন দেশের সার্বিক বিষয় উল্লেখ পূর্বক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পাশ করে আসছে, যা পরবর্তীতে স্মারকলিপি আকারে সরকারের নিকটে পাঠান হয়। এ সকল সম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বান মণ্ডলী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। যার ফলে বহু পথ ভোলা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে আলোর জগতে ফিরে এসেছে। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিটি ইজতেমায় দেখতে পেয়েছি।

প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রকাশনা জগতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পর্যন্ত বহু বই ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, সমাজ বিপ্লবের ধারা, তিনটি মতবাদ, একটি পত্রের জওয়াব, নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, উদাত্ত আহ্বান, দা'ওয়াত ও জিহাদ, শবেবরাত, মীলাদ প্রসঙ্গ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে নাম মাত্র মূল্যে দেশের বিভিন্ন যেলায় বিতরণ করা হয়। এছাড়া '৭৯-এর সেপ্টেম্বরে কবর পুজার বিরুদ্ধে "দয়াল খাজা বাবা" ইশতেহার বিলি করা হয়। '৮০ সালের জুলাই মাসে আন্দোলন সিরিজ-২ 'শিরক হ'তে বাঁচুন' বুকলেট আকারে ছাপিয়ে ফ্রি বিতরণ করা হয়। '৮১ সালের জুন মাসে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, সাহারী ইফতারের সময় সূচী সম্বলিত 'স্থায়ী ক্যালেণ্ডার' যুবসংঘ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। '৮৪ সালের জুন মাসে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ক্বায়েমের দাবীতে 'রামাযানের ডাক' শিরোনামে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে পোষ্টারিং করা হয়। প্রতি বৎসরই রামাযান মাসে আমাদের আহবান নামে পোষ্টার এবং রামাযানের তোহফা নামে সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী ছেপে সারা দেশে বিতরণ করা হয়। ১৯৯১ সাল হ'তে '৯৫ সাল পর্যন্ত

জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা বের করা হয়েছে। '৯২ সালে যুবসংঘের উদ্যোগে দৈনিক পত্রিকা বের করা হয়। কিন্তু সরকারী অনুমোদন না পাওয়ার কারণে দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর আর সম্ভব হয়নি। এছাড়াও প্রতি সেশনে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠনের নীতি ও আদর্শ সম্বলিত সংক্ষিপ্ত প্রচার পত্র পরিচিতি 'ক' ও পরিচিতি 'খ' এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রণ করে ফ্রি বিলি করা হচ্ছে।

বর্তমানে এদেশে চারটি ধাপে অত্যন্ত দুর্বার গতিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কাজ চলছে। আর সে ধাপগুলো হ'লঃ (ক) অনুর্ধ ১৩ বছর বয়সের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কাজ করছে **'সোনামণি'** (খ) ১৪ থেকে ৩২ বছর বয়সের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে কাজ করছে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** (গ) ১৩ বছরে উপর থেকে মহিলাদের মধ্যে কাজ করছে **'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'** (ঘ) এবং ৩২ বছরের উপর থেকে পুরুষদের মধ্যে কাজ করছে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**। মূলতঃ বর্তমানে এটিই মূল সংগঠন আর বাকী গুলো উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত তার অঙ্গসংগঠন।

এ সংগঠনের বয়স ২২ বছর পার হ'তে চললো। সাংগঠনিক নীতিমালার দিক দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নির্ভেজাল ইসলামী যুবসংগঠন। এ সংগঠনের কর্মীদের চারটি স্তরে বিন্যাস করে বর্তমানে কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত প্রাণ হয়ে দেশের বিভিন্ন যেলাতে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া এ সংগঠনের সাংগঠনিক নীতিমালায় তাদের দ্বীনি দায়িত্বের কাজ অব্যাহত রেখেছে। এমনিভাবে সুসংগঠিত কর্মীবাহিনী দ্বারা এ সংগঠন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ৪০টি যেলাতে আহলেহাদীছ যুবসংঘের কাজ সাংগঠনিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি যেলাতে ৮ এর অধিক এলাকা আছে (কোন কোন যেলাতে ১৬টিরও অধিক এলাকা আছে) এবং প্রত্যেক এলাকার অধীনে আছে কমপক্ষে পাঁচটি করে শাখা। এমনিভাবে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সংগঠন চারটি সাংগঠনিক স্তরের মাধ্যমে এদেশে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে আসছে। ইনশাআল্লাহ এ সংগঠন ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। দীর্ঘ ২২ বছর ধরে যে সকল ভাই এ সংগঠনের মূল দায়িত্বশীল (সভাপতি) হিসাবে নিজ মেধা, যোগ্যতা ও শ্রমের বিনিময়ে এ সংগঠনকে অংকুরোদগম থেকে শুরু করে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে একটা পরিপূর্ণ বৃক্ষে রূপদান করেছেন তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

১। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা), তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ২। মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক (মেহেরপুর), ৩। মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা), ৪। শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা (ভারপ্রাপ্ত), ৫। মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর), ৬। মুহাম্মাদ হারূণ (সিলেট), ৭। মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী), ৮। হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া), ৯। মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান মীযান (কুষ্টিয়া)।

পরিশেষে, কোন প্রশিক্ষণ সেন্টারে যেমন কর্মীরা শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অতঃপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তার নিজ কর্মক্ষেত্রে ঐ প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়, ঠিক তেমন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ হ'ল একটা প্রশিক্ষণ সেন্টার। তাই অবশেষে এতটুকু কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি দীর্ঘ ২২ বছরে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কিছু না করলেও এমন কিছু যোগ্যতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক তৈরী করেছে, যারা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত সঠিক দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এবং এ সংগঠনের দা'ওয়াতী কাজ মহাপ্রলয়ের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সংগঠনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

ইচ্ছে

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেন
নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা, রাজশাহী।

মোদের বড় ইচ্ছে করে
মাদ্‌রাসাতে পড়তে,
মানুষ হয়ে পৃথিবীতে
দ্বীনের দাওয়াত দিতে।
পথে কোন বাঁধা এলে
জিহাদ করব সবাই মিলে।
মরলে মোরা শহীদ হব
বাঁচলে হব গাযী।
এই ধরাতে আমরা হব
বীর মুজাহিদ আজি।

****

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

স্মরণিকা

-আব্দুল মাজেদ
নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা, রাজশাহী।

স্মরণিকা তুমি এগিয়ে চল
দিকে দিকে আলো জ্বাল।
স্মরণিকা তুমি নির্ভীক
কাহার তরে করনাকো তুমি কুর্নিশ।
স্মরণিকা তুমি এক দূরন্ত সৈনিক।
স্মরণিকা তুমি ভেঙ্গে দাও বাতিলের ঘর
স্মরণিকা তুমি বিষাক্ত কাঁটা শত্রুতের চোখে
স্মরণিকা তুমি সত্য বাণী যাও লিখে।
স্মরণিকা তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের পথে চল
স্মরণিকা তোমায় যে, পড়তে লাগে বড় ভাল।

* * * * * * * * * * *

সুখ

-নাছরীন, ডেমাজানী, বগুড়া।

আল্লাহর হুকুম মানবো মোরা
থাকবো ভাল কাজে।
মন্দ থেকে থাকবো ফিরে
এই দুনিয়ার মাঝে।
পরকালে পাব সবাই
জান্নাতের সুখ।
দেখবো না কেউ দুনয়নে
জাহান্নামের দুঃখ।

সত্যের আহবান

-আবু সাঈদ, রসূলপুর মাদ্‌রাসা

ডাক এসেছে জগৎ জুড়ে
সত্য, ন্যায়ের ডাক
শিশু-কিশোর, তরুন, যুবক,
জাগরে তোরা জাগ।
ধরা হ'তে মুছতে হবে
যুলুম অবিচার
জগৎ জুড়ে আনতে হবে
সবার অধিকার।
তাই তো সবার জাগতে হবে
ছাড়তে হবে ভয়
এই ধরাতে সত্য ক্বায়েম
হবে সুনিশ্চয়।

ফিরে দেখ ইতিহাস

-মীর মুহাম্মাদ আব্দুন নাযের
রহীমপুর, নাটোর

জাগো মুসলিম জাগো,
পিছু ফিরে দেখ ইতিহাস তব
দ্বিগ্বিজয়ীর বেশে,
ভ্রান্ত ধারণা কুপ্রথা সব
রয়েছে মাটিতে মিশে।
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, হিংসা কেন আজ
অন্তরে কু-প্রভাব,
তোমায় দেখিয়া বিধর্মীরা
পাইবে সুস্বভাব।
উচুঁ-নীচু জাত বিভেদিয়া দেখ,
ধর্মের ভিত কিসে।
পূর্ব কালের রক্ত রবি যেন
পশ্চিমাকাশে পাই,
সেইরূপ ত্যাগ, মহান সাধনা
আজিও বিকাশে নাই।
স্বরচিত মতবাদের দূর্গ,
ধ্বংসিবে অবশেষে।
শির্ক বিদ'আতের ভন্ড পাপিরা
চায় সুখ ধরণীর,
তোমার হৃদয়ে ভয় কেন আজি
তুমি যে জিহাদী বীর।
শয়তানী যত আড্ডা খানা,
ভেঙ্গে ফেল পায়ে পিঁষে।
ঈমানের বলে খুঁজিয়া ফিরিবে
কুরআনী রীতি-নীতি,
অন্তরে গাঁথা স্রষ্টার বাণী
আজো জাগে সব স্মৃতি।
তাওহীদি পতাকা জাগিয়ে তোল
মুসলিমের এ দেশে।
মরীচিকা সব যশ মান ধন
রইবে পড়ে এ ভবে,
চিন্তা কর না ওপারে তোমার
আমলের কি হবে।
জীবনাবসান হইতে হইবে
রাসূলের আদেশে।